অপরিচিতের নাম

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ সাল

মুদ্রাকর :
শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ,
নিউ কালী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

করকমলেষু—

লেখকের অন্যান্য বই :—

জনপদবধূ, দেবকন্যা, এ জন্মের ইতিহাস, দ্বিতীয় অন্তর,
তীরভূমি, সুদক্ষিণা, এই তীর্থ, শান্তির স্বাক্ষর, পটমঞ্জরী,
সিন্দুর টিপ, নীলাঞ্জন ছায়া, নয়ানজুলি কামিনীকাঞ্চন,
অভিমানী আন্দামান, নতুন নাম, নতুন ঘর, বিদিশার নিশা
জলকন্যা, কতো অজানার সঙ্গ, উত্তরাধিকার, কর্ণাটরাজ প্রভৃতি॥

॥ ১ ॥

শহরের জমকালো অংশের ঝক্‌ঝকে বিপণি আর জন-যান-অস্থির রাজপথের পাশ দিয়ে এ-ধরণের ক্ষুদ্র আর অন্ধকার কোনো গলি যে বেরিয়ে আসতে পারে—সেটা সত্যিই অকল্পনীয়। আরও অকল্পনীয় গলির ভিতরকার এই বাড়ীটি। চারপাশের অপেক্ষাকৃত নতুন ইমারৎমণ্ডলীর মধ্যে ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে কোনক্রমে যেন টিকে আছে। সামনের দিকে একটু-আধটু মেরামত করা, একটা হলদে রঙের প্রলেপও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভিতরের দিকে যদি একটু ঢুকে যাওয়া যায় ত খোপে-খোপে ভর্তি অসংখ্য ঘর চোখে পড়বে। বাড়ীটা বেশ উঁচু, দোতলা। এ-উচ্চতায় অনায়াসে তিন, কিম্বা চারতলা পর্যন্ত ঘর করা যেতো হাল আমলে, কিন্তু গথিক রীতির জানালা বা দরজার গঠন প্রণালী দেখেই বোঝা যায়—যে-কালে এ-বাড়ীটা তৈরী হয়েছিল, সে-কালে স্বাভাবিক বাতাস চলাচল ও আলো পাবার জন্য মানুষ ঘরদোরগুলো যথেষ্ট উঁচু রাখবারই প্রয়াস করতো। আজকাল বৈদ্যুতিক বাতি আর পাখার কল্যাণে মাথার ওপরকার ছাদ নীচু হলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু যাক্‌ সে-কথা। বাড়ীটার বৈশিষ্ট্য আরও আছে। রাস্তা থেকে বাড়ীটা একটু নীচু। অর্থাৎ সেকালে বাড়ীটা যখন তৈরী হয়েছিল, তখন গলিটা নীচু ছিল। এখন গলিটা উঁচু হওয়ায়

বাড়ীটা নীচু হয়ে গেছে। বাড়ীটা লম্বাটে ধরণের, খোপ-খোপ ঘর সারি সারি চলে গেছে ভিতরের দিকে। সেকালে ঘরগুলো বড়ো-বড়োই ছিল, বোধহয় সেকালের কোনো সৌখীন মানুষেরই বাড়ী ছিল এটি। এখন একখানা ঘরকে পার্টিশন ক'রে চারখানা ঘরে পরিণত করা হয়েছে। ফলে কোনো-কোনো অংশ এত অন্ধকার, যে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

বাড়ীর সামনের দিকের একতলায় পাশাপাশি দুখানি দোকান-ঘর। একটি খুবই বড়ো, সেটির মাথায় কোন সাইনবোর্ড নেই, কিন্তু ভিতরে তাকালেই চোখে পড়ে, মানুষগুলো মুখ নীচু করে একমনে সেলাইয়ের পা-কল চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ-বা মাদুরের ওপরে ব'সে ফিতে দিয়ে মেপে কাপড় কাটছে। সম্ভবত ট্রাম-বাস সমাকীর্ণ অদূরের বড়ো রাস্তাটার ওপরকার কোনো সুবিখ্যাত জামাকাপড়ের দোকানের সেলাই বিভাগ এটি। কিন্তু এটি নিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন পাশের ছোট্ট দোকানটি নিয়ে। দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু ভিতরের দরজা দিয়ে আরও ভেতরে ঢুকলে দোকানটার আসল কার্যকলাপের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজাটা অবশ্য এই ছোট্ট দোকানটার পাশ দিয়ে। গলি থেকে দরজার চৌকাঠে আসুন দেখবেন সিঁড়ির ধাপকাটা আছে দুটো কি তিনটে। সেই ধাপে পা দিয়ে পা দিয়ে আপনাকে লম্বা ফালি উঠোনটায় নামতে হবে। উঠোনটার শেষ প্রান্তে আছে সিঁড়ি। একটু উঠে তারপরে ডানদিকে বেঁকে দোতলায় চলে গেছে। কিন্তু এ-দোতলা নিয়েও আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমাদের প্রয়োজন একতলাটুকু নিয়ে এবং তা-ও সামনের দিক্‌কার। সেখানেও ধাপকাটা আছে, দু'-এক পা নামলেন।

ইঁট বার করা মেঝে, একপাশে খানকতক চেয়ার, অন্যপাশে কাঠের একটা কাউণ্টার মতো। সেই কাউণ্টারের মধ্যে বসে আছে সলোমন সাহেব, একটা টেবিল ফ্যানের পাশে। কাউণ্টার ঘেঁষেই ভিতরে যাবার দরজাটা। একটা মোটা পর্দা ঝুলছে দরজার সামনে। পর্দাটা খয়েরী রঙের, কালো ডোরাকাটা। বেশ ময়লা, খয়েরী রঙ বলে দূর থেকে চট্ করে মলিনত্বের পরিমাপ সঠিক বোঝা যায় না।

ঘরখানার প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে ছোট বড়ো নানা সাইজের ফটো, কতগুলো ফ্রেমে বাঁধানো, কতগুলো আবার তাও নয়, ভিতরের দেয়ালে পেরেক ঠুকে লাগানো। বলা কর্তব্য, ভিতরের দেয়ালটা কাঠের। লম্বা ঘরখানাকে কাঠের পার্টিশন করে তিনটি ঘরে পরিণত করা হয়েছে। বাইরেরটা, সলোমন সাহেবের ভাষায় 'শো-রুম', তার পরেরটা 'স্টুডিও', তার পরের অর্থাৎ সব থেকে ভিতরকার ঘরখানা হলো 'ল্যাবরেটরী'।

দোকানটার সামনে, অর্থাৎ বাইরের দরজার মাথার ওপরে কালো বোর্ডের ওপরে মোটা মোটা সাদা অক্ষরে লেখা 'সলোমনস্ স্টুডিও'।

দরজার পাল্লা দুটোর ভিতর দিকে ফ্রেম লাগানো, সেই ফ্রেমের ভিতরে ছবি। অর্থাৎ পাল্লা খুলে ঠেলে রাখলেই ছবিগুলো পথিকদের চোখে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। বিষণ্ণ একটি মেয়ের মুখ, কিম্বা স্নানের সংক্ষিপ্ত পোশাকপরা হাস্যমুখী মেমসাহেব— সলোমন-সাহেবের ভাণ্ডারে কী নেই?

হাল্কা গোলাপী রঙের ট্রাউজারের ওপরে ফুলহাতা শার্টপরা, ডান কাঁধে একটু কুঁজ আছে, একটু নীচু হয়ে চলে,—চোখেব দৃষ্টি, ঘোলাটে,—দাড়িগোঁফ কামানো, টাকমাথা সেলোমন সাহেবের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না।

এ-হেন সলোমন সাহেবের স্টুডিওতে তেমন একটা কর্মব্যস্ততা কখনোই লক্ষ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বাইরে বড়ো রাস্তার মোড়ে শার্ট-পায়জামা-পরা যে-লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোজা অথবা সস্তা ফাউন্টেন পেন বিক্রী করে, তাদেরই কেউ কেউ এসে হাজির হয় গেঁয়ো কতগুলো মানুষ সঙ্গে নিয়ে, হাতে তাদের পুঁটলীবাঁধা। তাদের চোখ মুখ দেখেই বোঝা যায়, তারা নতুন এসেছে শহরে। সলোমন সাহেব মুখ তুলে ওদের দিকে তাকায় ঘোলাটে দৃষ্টিতে, তারপরে কাউন্টার ছেড়ে এসে পর্দা ঠেলে ভিতরের ঘরে ঢুকে পড়ে। সুইচটা জ্বালায়।

বাইরে থেকে সেই শার্ট পায়জামা পরা যুবকটি বলে,—সাব, যাবো?

—ইয়া। কাম্ ইন্।

গেঁয়ো লোকগুলোকে তাড়া দিয়ে ভিতরে ঢোকায় লোকটা। তারপরে সাহেবকে সাহায্য করে এটা-ওটা হাতের কাজ করে দিয়ে।

সাহেবের স্টুডিও ঘরখানা খুব ছোট নয়। পিছন দিকে বিরাট একটা দরজা আছে। কিন্তু সে-দরজা দেখা যায় না। তাকে ঢেকে দিয়ে ছাদ থেকে ঝুলে আছে ঠিক সেকেলে থিয়েটারের সিনের মতো তিন্‌টে সিন্। ঠিক থিয়েটারের মতই একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে টানলে কাঠের ডাণ্ডায় গোটানো সিনটা খুলে নেমে আসে, অথবা ফেলা সিনটা গুটিয়ে গুটিয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

সাহেবের তিনটে সিনের একটা হচ্ছে আগাগোড়া কালো একটা পর্দা। আর দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে ফুলের বাগান, অন্যটা থাম-টাম বসানো জমকালো অট্টালিকার একটা অংশ। সিন্‌গুলো জায়গায় জায়গায় বিবর্ণ হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায়

রঙ উঠে গেছে একেবারে, সলোমন সাহেব ক্বচিৎ কখনো সে-সব জায়গা নিজেই ব'সে মেরামত করতো রঙ আর তুলি দিয়ে।

এবং সে-ও খুব একটা শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ালে, তবে।

এক কথায়—এই-ই হচ্ছে সলোমন সাহেবের স্টুডিও। তার একটা ক্যামেরা আছে মান্ধাতার আমলের। সেই বড়ো কাঠের পা-ওয়ালা, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে যে-ক্যামেরার কাজ করতে হয়, সেই ক্যামেরা। এই ক্যামেরাতেই সে ঐ ধরণের গেঁয়ো লোকদের ছবি তোলে।

তার স্টুডিও ঘরের পিছনের ঘরখানা আবার কাঠের পার্টিশনে তিনভাগে বিভক্ত। তারই একটি ঘর তার ডার্ক-রুম। নিজেই ক্যামেরার প্লেটগুলো ডেভেলাপ করে নেয়।

যে-ঘরে বসে সে ডেভেলাপ করে, তার পাশের ঘরখানায় সে শোয়। তার ট্রাঙ্ক, তার খাবার টেবিল, তার শোবার খাট সব ঐ একই ঘরে গাদাগাদি করে সাজানো। কিন্তু তৃতীয় ঘরটির চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রূপ।

এ-ঘরেও শোবার বিছানা আছে, এ-ঘরেও টেবিল-চেয়ার আছে, কিন্তু সবই দামী জিনিস এবং সুদৃশ্য।

এ-ঘরের মেঝেতেও আগাগোড়া গালিচা পাতা। ঘরের লাগোয়া বাথরুম ইত্যাদি। এবং এ-সবই যথেষ্ট ঝাড়পোঁচ করা, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

এ-ঘরখানায় হঠাৎ কেউ ঢোকে না। ঢুকলে মনে হবে, বিশেষ কোনো ধনী মানুষের ঘরে হঠাৎ বুঝি ভুল করে ঢুকে পড়েছি।

যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন সলোমন সাহেব নির্বিকার চিত্তে তার কাউণ্টারে বসে আছে, স্টুডিওতে আর কেউ নেই। সলোমন-সাহেব খুব মিশুকে নয়, তার ঘরে যখন তখন কেউ আড্ডা দিতে

আসে না। এমন কি খবরের কাগজটাও সে রাখে না কাউণ্টারে যে পাড়ার কেউ চাইতে আসবে।

সবাই জানে মানুষটি একা, এমন কি রান্নাবান্নার পাটও তার নেই, কাছের একটা হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খায়।' নিজস্ব চাকর বা বেয়ারাও তার নেই ফাইফরমাস খাটবার জন্য, ঘরদোর পরিষ্কার নিজের হাতেই করে; যদি কখনো কোনো সাহায্যের দরকার হয়, ত, ঐ যে মোড়ে দাঁড়িয়ে মোজা গেঞ্জী বিক্রী করে হকার ছোকরাটি, সে-ই এসে উপস্থিত হয়। ওকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না সলোমন সাহেবের কাছে। ন'মাসে ছ'মাসে কচিৎ কখনো দেখা যায়, বিলাসপুর না কোথা থেকে ওর বোনঝি এসে হাজির হয়েছে। সে-ও দু' তিনদিনের জন্য বড়জোর; তারপর যা ছিল তাই। সলোমন সাহেব সলোমন-স্টুডিওর নির্জন কাউণ্টারে বসে আছে চুপচাপ।

নির্বিরোধী একক মানুষ সলোমন সাহেব, কন্তু তারও জীবনে যে কোনো রহস্য থাকতে পারে, এটা বাইরে থেকে ধারণা করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

॥ ২ ॥

কিন্তু সেই রহস্যেরই সঞ্চার আমরা লক্ষ্য করলাম সেই দিন, যেদিন থেকে আমাদের কথারম্ভ। শ্রাবণ-শেষের মেঘমলিন দিন বলা যায়। ভোরের দিকে কিছু বৃষ্টি হয়েছিল; আপাতত ক্ষান্ত আছে। একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর প্রিয় রঙ ছিল সিপিয়া। সেই ঘন সিপিয়া অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ মেঘরঙ ধীরে ধীরে তরল হয়ে সারা আকাশটায় ছড়িয়ে গেছে। বেলা যে প্রায় সাড়ে ন'টা, আকাশ দেখে তা' সহসা বোঝবার উপায় নেই।

সলোমন-স্টুডিওর গলির অনতিদূরে যে বৃহৎ চৌরাস্তার মোড়টি আছে, সেই মোড়ে ঠিক সেই সময় চলমান গাড়ীগুলো হঠাৎ থেমে গেছে। পুলিশের বাঁশী, সার্জেন্টের হাঁকডাক। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, দুটি একটি গাড়ীর বক্র-গতির জন্য বাকী গাড়ীগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অসহিষ্ণু কয়েকটি হর্নের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আর, নির্বিকার চিত্তে কিছু লোক সার দিয়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে; রাস্তার লাল বা সবুজ সঙ্কেত সম্বন্ধে আদৌ তারা সচেতন হচ্ছে না। তাদের ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, তারা এতে অভ্যস্ত। সার্জেন্টটি এগিয়ে গিয়ে তাদেরই একজনকে ধমক দিলো প্রচণ্ড ভাবে,—দেখছেন না, সবুজ আলো? এখন পার হচ্ছেন কেন?

লোকজন ঠিক তেমনি পার হতে লাগলো সার্জেন্টটির দিকে

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ; দু-একটি তরুণ ছেলে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলো শুধু।

এই সুযোগে আর একটি ছেলে করলো কী, সারিতে যোগ না দিয়ে রাস্তা বরাবর গাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে টপ্‌কে টপ্‌কে ওপারে যেতে লাগলো। প্রায় ছ'ফিট লম্বা ছেলেটি, মাথার চুল বড়ো-বড়ো, কপালের ওপর বন্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। গায়ের সার্টটার রঙ ফিকে হল্‌দে, পরণের প্যাণ্টটা কালো। ছেলেটার চেহারা শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীতে একটা লাবণ্য আছে। দেহ সৌষ্ঠবেও একটা লালিত্য লক্ষ্য করা যায়। চওড়া বুক, শক্ত হাতের কব্জি, কিন্তু সব মিলিয়ে কাঠিন্যের থেকে কোমলতাই চোখে পড়ে বেশী।

ছেলেটা যখন রাস্তা পার হয়ে এলো, তখন আবার বেজে উঠলো পুলিশের বাঁশী, চলমান যানগুলোর সারিও চঞ্চল হয়ে উঠলো একটু। যেন একটা কোনো পথ পাওয়া গেছে, দাঁড়িয়ে পড়া গাড়ীগুলো এইবার চলতে আরম্ভ করবে।

সকালবেলা। মেঘমলিন দিন। তবু ছেলেটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। এক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ে ছেলেটি একটা রুমাল বার করলো, ঘাম মুছে ফেললো, তারপরে রুমালটা আবার যথাস্থানে রেখে ফুটপাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো পুব দিকে। একটা গীর্জা, কয়েকটা দোকান, সব পার হতে হতে সে মুখ ফিরিয়ে একবার সার-দেওয়া ট্রামগুলোর দিকে তাকালো।

ট্রামগুলো তখনো গতিবেগ প্রাপ্ত হয়নি, তবে এইবার চলতে শুরু করবে বলে মনে হয়। যারা নেমে পড়েছিল, তারা আবার পিছিয়ে যার-যার ট্রামে গিয়ে উঠে পড়ছে।

ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলো। মুখখানা নীচু করে সে হাঁটছে। কী একটা চিন্তা তাকে যেন অস্থির করে তুলছে, আর সে-ভাবটা সে কাটিয়ে ওঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আরেক বার দাঁড়িয়ে পড়ে মুখটা সে মুছে নিলো। আবার চলা। চলতে চলতে একসময় সে পৌঁছলো এসে সেই অপরিসর গলিটার প্রান্তে, যার মধ্যে ঢুকে কিছু এগোলেই সলোমন স্টুডিওর সামনাসামনি এসে পড়া যায়।

আশ্চর্য, ছেলেটা ধীরপায়ে এসে উঠলো সত্যি সত্যি সলোমন স্টুডিওতেই। সলোমন সাহেব পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিল ঠায় এক ভাবে। ওকে দেখে মাছের চোখের মতো চোখ দুটি তুলে একবার দেখলো, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ফ্যাঁস ফেঁসে হাঁপানি রোগীর গলার স্বরের মতো বললে,—ইয়ু আর লেট্। তোমার পার্টনার এসে বসে আছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল।

ছেলেটা ভিতরে ঢুকেই বসে পড়েছিল। ওর কথায় একটু চকিত হলো। তার পরে আবার নিজেকে চেয়ারের মধ্যে তলিয়ে দিতে দিতে বললে,—হ্যাঁ, লেট্ একটু হলো। আমি—

ওকে বাধা দিয়ে সলোমন বলে উঠলো,—কাম্।

সলোমন উঠে দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণে। ছেলেটি একটু বুঝি বা অবাক হয়েই ওর দিকে তাকালো। তারপরে সলোমন তার স্টুডিও-ঘরের দিকে ঢুকে যায় দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—বাট্, মিস্টার সলোমন—?

সলোমন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালো, বললে,—ইয়েস্?

—আমি বলছিলাম কী,—ছেলেটা একটু ঢোক গিলে বললে,—এখানেই একটু রেস্ট নি না?

—রেস্ট?—সলোমনের চোখ দুটো যেন মুহূর্তের জন্য কৌতুকে নেচে উঠলো, বললে,—সে ত ভিতরে গিয়েই নিতে পারবে? সারাদিন তোমার রেস্ট। তোমাকে আমার দরকার সন্ধ্যের পরে। তাই বয়, নিজের হাতে অ্যাডভান্স নিয়ে গেছো একশো টাকা,—এখন পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন?

ছেলেটা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—না না, পিছিয়ে পড়ছি না, মানে—

সলোমন কয়েক পা হেঁটে এলো ওর দিকে, বললো,—কতখানি বিশ্বাস তোমাকে করেছি, ভেবে দেখ। তোমার ঠিকানা জানিনা, এমন কি, তোমার নামটাও জানিনা,—অথচ তবু তোমাকে একশো টাকা—বুঝতে পারছো? আই রিস্‌ক্ ইট্, ইন্ ইন্‌টারেস্ট অব মাই বিজনেস্।

ছেলেটা একটা হাতে তার কপালের রগ ছুটো টিপে ধরলো।

সলোমন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে,—কী হয়েছে? মাথা ধরেছে নাকি?

—না না, ও কিছু নয়,—ছেলেটা হাত নামিয়ে মুখখানা সোজা ওর মুখের দিকে তুলে ধরলো, বললো,—চলো, কোথায় যেতে হবে।

সলোমনের চোখ ছুটো আবার কৌতুকে ঝিলমিল করে উঠলো, বললে,—এই ত বুদ্ধিমান ছেলের মতো কথা। এসো আমার সঙ্গে।

উঠলো এবার ছেলেটা। ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো সলোমন, বললে,—তোমার চা খাওয়া হয়েছে?

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলে উঠলো,—চা! হ্যাঁ, তা—খেয়েছি।

সলোমন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলো,—মাই ফ্রেণ্ড, ভিতরে তোমার ব্রেক্‌ফাস্ট রেডা আছে। চা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। নাও, এসো।

স্টুডিও ঘরে এর আগের দিনই এসে ঘুরে গিয়েছিল ছেলেটা তাই এ-ঘরটাকে তার নতুন লাগলো না একটুও। নতুন লাগলে স্টুডিওর পিছন দিকটা।

কুঁজোসাহেব সলোমন ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে একটু তাকালো

তারপরে এগিয়ে এলো স্টুডিওর দরজার কাছে, সেটা বন্ধ করে একেবারে খিল তুলে দিলো। দিতে দিতে বিড় বিড় করে কী যেন বকলো। তারপরে সোজা এগিয়ে এসে সিনগুলো একে একে গুটিয়ে ফেললো, তারপরে পিছনের দরজাটা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে বললে,—কাম্।

যন্ত্রচালিতের মতো ভিতরে চলে এলো সে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল সলোমনসাহেব ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে। ও কাছে আসতেই মৃদুকণ্ঠে সাহেব বললে,—ভিতরে আছে। খুঁজে নাও। আমি চললাম বাইরে।

বলেই আর দাঁড়ালো না, স্টুডিওর ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। বন্ধ করার মুহূর্তে ওর কাণে এসে পৌঁছলো,—তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটা। দরজার ওপারে, ও বেশ অনুভব করতে পারলো, সিনগুলো আবার পড়ে গেল পর পর, সলোমন সাহেব স্টুডিওর দরজা খুলে তার শো-রুমে গিয়ে যথাস্থানে বসলো, অথবা রাস্তার কাছে এগিয়ে গিয়ে চা আনবার জন্য অনুগত কাউকে হাঁকডাক করা শুরু করলো।

ছেলেটা এসব ভাবতে ভাবতে রুমাল বার করে আবার মুখটা মুছে ফেললো। তাকালো চারিদিকে। দিনের বেলা, তবু ভিতরকার এই প্যাসেজটার ছাদ থেকে ঝুলেপড়া বাল্‌বে আলো জ্বলছে। ঘর। কাঠের পার্টিশন। ভারী পর্দা ফেলা রয়েছে একটা ঘরের দরজায়। তার ভিতর থেকে আলোর ছটা খানিকটা এসে পড়েছে বাইরে। অপর ঘরটা অন্ধকার। বুঝতে কষ্ট হয় না, কোন্ ঘরে সেই অজানা-অচেনা-অদেখা মেয়েটি বসে রয়েছে।

॥ ৩ ॥

ঘরের মধ্যে এখুনি তাকে ঢুকে পড়তে হবে, তবু ওর পা ছুটো নড়লো না। ঠাণ্ডা একটা হিমস্রোত যেন শরীরের ওপর দিয়ে মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে গেল। একশো টাকা অগ্রিম নিয়েছে সে সলোমন সাহেবের কাছ থেকে। নইলে এখনি সে গিয়ে স্টুডিওর বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে চীৎকার করতো। সেই চীৎকার শুনে সলোমন সাহেব দৌড়ে আসতো, আর দরজা খোলামাত্রই সে ফাঁক পেয়ে একেবারে এক ছুটে গিয়ে পড়তো বাইরের রাস্তায়। আর তাকে পায় কে! সম্পূর্ণ পলাতক হতো সে।

—অথচ,—ম্লান একটু হাসলো ছেলেটি, নিজের মনেই বললো, —পালাতে পারতাম কী? প্রচণ্ড অভাব রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে। কোথায় যাবো?

ছেলেটি মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে গেল পর্দাফেলা ঘরটার দিকে। কিন্তু তবু ঢুকতে পারলো না। থমকে দাঁড়ালো। আবার তার মন বললে,—কী হতো এই কুঁজো বুড়োটার সঙ্গে দেখা না হলে? স্কুল-কলেজের-দরজা-থেকে-ফিরে-আসা-ছেলে-আমি। এই বিশাল বিশ্বে কোন্ কাজেই বা লাগতে পারতাম!

বাবা গত হয়েছেন বহুদিন, কিন্তু বাবার সেই গৌরবর্ণ সৌম্য শান্ত মূর্তিটি কখনো ভুলবার নয়। ভোরবেলায় আমাকে নিয়ে যেতেন গঙ্গাস্নান করতে। খুব ছোট আমি তখনো, ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

বাবা সূর্যোদয়ের মুহূর্তে স্তব পাঠ করতেন,—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ !…

কিন্তু কোথায় গেল সে-সব দিন !—ছেলেটা আপনমনেই ভাবছে,—চেহারাটা ছিল, পাড়ার এক দাদা ছিল সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আমাকে একদিন ডেকে বললে,—সিনেমা করবি চল। খাসা চেহারা, তোকে হিরো করে দেবো।

ভাবতে ভাবতে ম্লান একটু হাসলো সে, আপন মনেই বললো, —হিরো হতেই চলেছি বটে।

ছেলেটির পাড়াতুতো দাদা ওকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল বটে, সেই থেকে বছর দুই ধরে নানান্ স্টুডিও আর ডিরেক্টর-প্রডিউসারের বাড়ী ধর্না দিয়েছে, কিন্তু ঐ চার-পাঁচদিনের কাজ করে করেই তাকে হিরো হবার উত্তুঙ্গ তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছে।

—না, এভাবে চলবে না,—ছেলেটি মনে মনে বললে,—টাকার যখন দরকার, টাকা যখন আমাকে পেতে হবেই তখন নার্ভাস হলে চলবে না।

বলে, জামাটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে, অবিন্যস্ত চুলে একটু হাত বুলিয়ে ছেলেটি ভারী নিশ্চল পর্দাটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে ভেসে এলো মৃদু অথচ গম্ভীর গলার স্বর,— স্টিল স্ট্যাণ্ডিং ? এখনো এখানে দাঁড়িয়ে ?

একটু চমকে পিছন দিকে তাকালো ছেলেটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং সলোমন সাহেব। একটা ট্রে আর দু' কাপ চা। ভিতর থেকে কখন সন্তর্পণে দরজা খুলে কুঁজোসাহেবটা এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলেটা টের পায়নি।

ওকে নির্বাক দেখে সাহেব নিজেই এগিয়ে এলো ওর দিকে, তারপরে ঘোলাটে দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে বললে, —কাম্।

আর তারপরেই ভারী পর্দা ঠেলে ট্রে-শুদ্ধ ভেতরে ঢুকে গেল সলোমন সাহেব।

পিছনে পিছনে যাওয়ার কথা ছেলেটির, কিন্তু তবু যেতে পারলো না, ভারী পর্দাটার এপারে দাঁড়িয়ে অনর্থক ঘামতে লাগলো।

ঘরের ভিতরে টেবিল গোছের কোনো বস্তুর ওপরে ট্রে রাখার শব্দ পাওয়া গেল, শোনা গেল ভারী মৃদু স্বর সলোমনের, আর তার সঙ্গে মিশে ভেসে এলো মৃদু মেয়েলী কণ্ঠে উচ্চারিত কয়েকটি অস্ফুট অক্ষর,—স্পষ্ট বোঝা গেল না, ঝংকারটুকু কানে এসে বেজে রইলো শুধু।

—কাম্ ইন্ মাই বয়,—আবার ভিতর থেকে ভেসে এলো সলোমন সাহেবের গলা।

না, আর দ্বিধা করা চলে না, চট্ করে রুমাল বার করে মুখখানা মুছে নিয়ে, যেন মেক্-আপ শেষ করে ফ্লোরে ক্যামেরার সামনে গিয়ে এখুনি দাঁড়িয়ে যথানির্দিষ্ট সংলাপ বলতে হবে, এমনিভাবে পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে পড়লো ছেলেটি।

একঝলক আলো। মুভী ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে জোরালো আলো এসে হঠাৎ যেমন করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সর্বপ্রথম, ঠিক তেমনি অনুভূতি হলো ছেলেটির: যদিও সিনেমার জোরালো আলোর সঙ্গে এ-ঘরের নীলাভ স্তিমিত স্নিগ্ধ ফ্লোরেসেণ্ট আলোর তুলনাই হয় না। তবে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গেল কেন? ছেলেটি চকিতের জন্য দেখে নিলো, বাঁদিকে টেবিলের ওপর একটা চোঙা বসানো টেবিলল্যাম্প জ্বলছিল, সেটা সে আসামাত্রই কে যেন চট্ করে ঘুরিয়ে দিলো তার দিকে, যাতে করে ফোকাস্-এর মতো আলো এসে পড়ে তার মুখের ওপরে।

মুহূর্তমাত্র। তারপরেই আলোর বৃত্তটা সরে গেল তার ওপর

থেকে। অর্থাৎ টেবিলল্যাম্পের চোঙাটা চট্ করে আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সলোমন সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সেই মাছের মতো চোখের দৃষ্টি। বললে,—তোমরা দুজনে আলাপ-পরিচয় করে নাও, সারাটা দিন রইলো তোমাদের জন্য, আমি চললাম।

বলেই, হাতের শূন্য ট্রে-টা নিয়ে বেরিয়ে গেল সলোমন সাহেব ভারী পর্দাটা ঠেলে।

ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে বাঁদিকের টেবিলের ওপারেই বিরাজ করছেন, এটা অনুভব করে সেদিকে প্রথমেই তাকাতে পারলো না ছেলেটি, তাকালো ডানদিকে। মেঝের ওপর কার্পেট জাতীয় কিছু একটা বিছানো, তার ওপর গদী, তোষক, বালিশ, সোনালী রঙের চৌকো চৌকো বুটি তোলা একটি বেড্‌কভার। দেওয়ালটা নীল রঙে ডিস্‌টেম্পার করা,—বোধহয় হালেই করা হয়েছে সেটা।

হঠাৎ নজর করলে, সব মিলিয়ে মনে হয়, ফিল্ম-স্টুডিওর কোনো সেট বুঝি। এখুনি পাত্রপাত্রীরা এসে বসবে এখানে, আর 'স্টার্ট সাউণ্ড' 'কাট্'—এইসব ইংরেজী শব্দের প্রক্ষেপণ শ্রুতিগোচর হবে।

সে একটি নতুন ঘরে ঢুকেছে, ঘরে দ্বিতীয় এক ব্যক্তির উপস্থিতিও অননুভূত নয়, তবু তার মনের কোনো প্রত্যন্ত তারে বুঝি ঝংকার তুললো স্মৃতি। চোখের সামনে মুহূর্তে ফুটে উঠলো একটি ছবি।

প্রথম দিনের প্রথম কাজ সেটা তার চিত্রজগতে। সে এগিয়ে গেল খাটের কাছে। একটি মেয়ে শুয়ে আছে চোখের নীচে কালি-টালি লাগিয়ে নিয়ে—মাথার চুল এলোমেলো ক'রে। যেন ভীষণ অসুখ তার। সে হাতে করে একটা ওষুধের শিশি নিয়ে ঢুকলো। তার নিজের কোনো কথা ছিল না সেই দৃশ্যে, কথা ছিল মেয়েটির।

তাকে দেখে রোগজীর্ণ মেয়েটি বলে উঠলো,—না—না—ও-ওষুধ নয়—ও-ওষুধ নয়, একটু বিষ এনে দাও—খেয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে ফেলি।

দৃশ্যটি তখন ক্যামেরায় পাকাপাকিভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছিল না, নেবার আগে 'মহড়া' দেওয়া হচ্ছিল শুধু। তবু, তার হাত দুটো কাঁপছিল থর থর ক'রে।

মেয়েটা কিন্তু তার কথাগুলো গড়গড় ক'রে ঠিক বলে গেল। ও নির্দেশমতো একটু পিছিয়ে আসবে, এসে শিশিটা টেবিলে রাখবে। ও-সব সে মনে করে রেখে যথাযথই করেছিল, কিন্তু টেবিলে শিশিটা ঠক্ করে রাখতেই, হঠাৎ কাছেই বেজে উঠলো 'চটাস্' ক'রে একটা শব্দ।

কে যেন খুব কাছে থেকেই বলে উঠলো,—বাবা, যা মশা!

চমকে মুখখানা ওপরে তুলতেই সে দেখতে পেলো, কাঠের দেয়ালের ওপরে খাকীর হাফ প্যান্ট আর হাত কাটা ময়লা আর ছেঁড়া গেঞ্জী পরে একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে বসে আছে জোরালো লাইট্-টার কাছে।

দরদর করে ঘামছে ছেলেটি, আর 'চটাস্, 'চটাস্' শব্দ করে মশা মারছে।

তার দিকে তাকাতে সে যে একটু অপ্রতিভ হয়েছে এমন মনে হলো না। বরং 'চটাস্' শব্দ ক'রে আর একটি মশা মারলো।

সব মিলিয়ে ঘটনাটা তার কাছে সেদিন অদ্ভুত এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্টুডিওর সেই তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা কখনোই ভোলবার নয়।

—নমস্কার অতনুবাবু।

প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠে বাঁদিকে ঘুরে তাকালো ছেলেটি। টেবিলের ওপারে একটা বেতের ইজিচেয়ারে বসে আছে মেয়েটি,

খোলা চুল, দুটি ভ্রূর মাঝখানে একটি ছোট্ট লাল টিপ,—শ্যামলী রঙ,—চোখের নীচে, যাকে বলে 'নয়ন-খাল', তা-ই আছে বেশ ভালোরকম। এবং তাতে ক'রে কোটর-প্রবিষ্ট বড়ো বড়ো চোখ দুটির দৃষ্টি হয়ে উঠেছে প্রখর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো ছেলেটির,—এতেই বরং মুখের ওপর একটা বুদ্ধির দীপ্তিকে অনুভব করা যায়। সিনেমা করতে গিয়ে যতগুলি মেয়ে সে স্টুডিওতে দেখেছে; তাদের সবার আছে অল্পবিস্তর নয়ন-খাল—এবং এক একজনকে তাতে করে মোটামুটি বুদ্ধিমতীই দেখায়। কিন্তু মেক্-আপ করার সময় সবাই রঙ দিয়ে ওটা ঢেকে মুখগুলোকে কেমন যেন বোকা-বোকা পুতুলমুখ করে তোলে।

মুহূর্তের জন্যই মনে হলো ছেলেটির, মেয়েটির পুতুল-মুখ না হয়ে ভালোই হয়েছে। যতো রূপসীই হোক, বোকা বোকা মুখ ওর ভালো লাগে না দেখতে।

এ-সব চিন্তা ওর এক পলকের। বিহ্বলের মতো মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ছেলেটি। মেয়েটি সপ্রতিভ। চোখের তারা দুটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ঝলমল করছে।

বিহ্বলতার ভাবটা পরমুহূর্তে কাটিয়ে নিয়ে ছেলেটি অস্ফুট বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো,—আমার নাম ত অতনু নয়!

মেয়েটি চোখের দৃষ্টি নত করলো, মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঠোঁটের ওপরে, ধীরে ধীরে বললো,—সারাটা দিন একসঙ্গে কাটাতে হবে।

বলতে বলতে আবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো মেয়েটি, বললে,—হয়ত নাম একটা দরকার। আমি না হয় 'অতনু'ই রাখলাম আপনার নাম। আপত্তি আছে?

ছেলেটির বিস্মিত অপ্রতিভ ভাবটা তখনো কাটেনি। তাকে

নির্বাক লক্ষ্য করে আবার চোখ নামালো মেয়েটি, বললে,—আপনিও একটা নাম রাখুন আমার,—যা খুশী।

ছেলেটি কোনক্রমে বললে,—না না, আমি—আমি—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে,—বসুন চেয়ারে। চা-টা খেয়ে নিন। আগের চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমি ফেলে দিয়েছি।

টেবিলটার সামনেই ছিল একটা ছোট্ট চেয়ার। ছেলেটি চেয়ারটা একটু টেনে ধপ্ করে বসে পড়লো। তার সামনেই সলোমন সাহেবের আনা দু'কাপ চা সাজানো রয়েছে। চায়ের কাপ দুটোর পিছনে একটা বড়ো প্লেট, অন্য প্লেট দিয়ে চাপা দেওয়া, আর কাঁচের গেলাসে রাখা একগ্লাস জল।

মেয়েটি একটা কাপ তার দিকে টেনে নিলো। কিন্তু তখুনি চুমুক দিলো না, কী ভেবে উঠে দাঁড়ালো। চাপা দেওয়া প্লেটটা সরিয়ে খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিলো ছেলেটির দিকে। কাট্‌লেট, পাঁউরুটির পিস, কিছু স্যালাড্ ইত্যাদি।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বললে,—খেয়ে নিন আগে।

ছেলেটিও মৃদুস্বরে বলে উঠলো,—আপনার ?

—হয়ে গেছে। নিন, সেরে নিন তাড়াতাড়ি।

বলে, আবার গিয়ে বসলো তার ইজিচেয়ারটাতে। ছেলেটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে হাতের ওপর উঠিয়ে নিলো চায়ের কাপটা।

ছেলেটি আর কোনো দিকে না তাকিয়ে চুপচাপ খাবারে মন দিলো। মেয়েটিও আর কোনো কথা বললো না, তার চা-টা শেষ করে কাপটা টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখলো। তারপরে আবার নিজেকে এলিয়ে দিলো ইজিচেয়ারে। হাতে কী একটা বই। বইটা খুলে মুখের সামনে ধরলো মেয়েটি।

একটা ফিকে নীলরঙের সাধারণ শাড়ী পরণে; নীলরঙের

জমিন, তার ওপরে কালো চৌকো চৌকো ঘরের ডোরা-কাটা। গায়ের ব্লাউজের রঙটা কালো, হাতা আর গলায় সোনালী বর্ডার। আজকালকার ধরণের পুঁতি না প্লাস্টিকের মালা গলায়, মালায় নীলবর্ণের বড়ো বড়ো দানা। হাত দুটোতে রবারের কালো চুড়ি দু'গাছি করে, সোনার ছিটেফোঁটা কোথাও নেই, এমন কি ফ্যাশন মতো হাতঘড়িও নেই। লেডীস্ ব্যাগ-ট্যাগ সঙ্গে থাকাই সম্ভব, কিন্তু এক নজরে সেটা লক্ষ্য করতে পারলো না ছেলেটি। হয়ত ইজিচেয়ারের ওপাশে রাখা আছে, ওর শরীরের আড়ালে পড়েছে আর কী!

মেয়েটি সম্ভবতঃ ওর ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। ও প্লেটটা নীচে নামিয়ে রেখে গ্লাসের জলটা শেষ করতেই মেয়েটি বইখানা সরালো মুখের সামনে থেকে। ধীর, শান্ত গলায় মেয়েটি কথা বললে। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা স্নেহের সুর। বললে,—স্নান-টান করে বেরিয়েছেন ত?

ছেলেটি উত্তর দিলো,—হ্যাঁ—না—মানে—

মেয়েটি অল্প একটু হাসলো, তেমনি সহানুভূতি মাখানো স্নেহের সুরেই বললে,—এখানে স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্নানটা সেরেই নিন না? আমার সকালবেলায় স্নান করা অভ্যাস কিনা। আমি সবাইকে স্নানের তাগিদ দিয়ে বেড়াই।

ছেলেটির চোখ পড়লো এবার মেয়েটির সিঁথির দিকে, অল্প একটু সিঁদুরের ছোঁয়া দেখতে পেলো। কিন্তু এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না।

মেয়েটি আবার তাকালো ওর মুখের দিকে, বললে,—সলোমন বলছিল, আপনি নতুন। মানে—

ছেলেটি মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক জোর এনে, সমস্ত

জড়তাকে মুহূর্তে মুছে ফেলবার জন্যই যেন বলে উঠলো.—না না, নতুন কেন হবো ? আমার অভিজ্ঞতা—

কণ্ঠস্বর ওর একটু উচ্চই হয়েছিল মনের উত্তেজনাবশত। মেয়েটি সেটা লক্ষ্য করে আবার অল্প একটু হাসলো, বললে,—বিবাহিত ? যদিও ব্যক্তিগত কথাটথা জিজ্ঞাসা করা আমার নিয়ম বিরুদ্ধ।

ছেলেটি তেমনি উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠলো,—নিশ্চয়ই। মানে—

মেয়েটা এবার স্পষ্টতই হেসে ফেললো। মুক্তোর মতো দশন-পংক্তিতে আলোর রেখা পড়ে দীপ্তিময় করে তুলেছে। সে বললে, —থাক, আর শুনতে চাই না। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। যা ভয় করছিল!

—কেন ? ভয় করছিল কেন ?—ছেলেটি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

মেয়েটি যেন আরও সহজ হয়ে উঠলো ওর কাছে, আরও সপ্রতিভ। হাতের বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো সে। দোহারা চেহারা, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গীই বলা চলে।

ওর দিকে তাকিয়ে বললে,—নিন, উঠুন এবার।

বিস্মিত হয়ে ছেলেটি বললে,—কোথায় যাবো!

মেয়েটি তেমনি করে অল্প একটু হাসলো, সরে গেল দেওয়ালের দিকে। একটি আলনা। কাপড়চোপড়। পাশে ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং-টেবিল ইত্যাদি। একটা বড়ো ভাঁজকরা ধবধবে টার্কিশ তোয়ালে কাঁধের ওপর ফেললো মেয়েটি, টেবিল থেকে সাবান-টাবান কী কী সব নিলো, তারপরে সটান বেরিয়ে গেল পাশের দরজা ঠেলে।

ছেলেটি রুমাল বার করে মুখখানা মুছে নিলো। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে একটা একটানা ঘটাং ঘটাং শব্দ করে। ছেলেটা না ঘামলেও তার মনে হচ্ছিল সে ঘামছিল।

॥ ৪ ॥

—না, আর পিছিয়ে গেলে চলবে না—ছেলেটি মনে মনে বললে, আমার নাম অতনু? বেশ অতনুই সই। আমি ঝোঁকের মাথায় বিবাহিত বলে ফেলেছি নিজেকে। বেশ, সেটাই মানিয়ে চলবো। এর পরে যদি বলে—ছেলেপিলে কী? তখন বলবো,—একটি মেয়ে একটি ছেলে। না-না, ওসব কিছুই নয়। বল্‌বো, ও-সব ব্যক্তিগত কথা বলা আমার নিয়ম বিরুদ্ধ। এক কথায়, খুব স্মার্ট হতে হবে। মেয়েটি যদি এক কথা বলে, আমি দশ কথা বলবো।

—নিন, বাথরুম রেডী, চলে যান ভিতরে।

মেয়েটি ভিতরের দরজা ঠেলে ঘরে এলো। বলতে বলতে চলে গেল ওয়ার্ডরোবের কাছে। খুলে ফেললো। ড্রয়ার টেনে-টুনে কী সব বার করতে লাগলো। করতে করতে মুখ ফেরালো,—কী পরবেন? লুঙ্গি, না পাজামা? সব আছে। কেচে-টেচে রীতিমত ইস্ত্রি করে রাখা। দেখছেন ত? সলোমন সাহেব কতো হিসেবী?

বলে, একটা দামী পুরু আকাশী রঙের বর্মী লুঙ্গি বার করে ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিলো। বললে,—যান না! বসে আছেন কেন?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। অপ্রতিভ অপ্রস্তুতের মতো বললে,—আমি মানে—স্নান—

বাধা দিয়ে কর্তৃত্বের সুরে বলে উঠলো মেয়েটি,—তা হোক। না হয় আমার খাতিরে আরেকবার স্নান করে এলেন! গরম কাল। খারাপ লাগবে না।

অগত্যা নীচু হয়ে পায়ের জুতো খুলতে লাগলো ছেলেটি। কানে আসতে লাগলো মেয়েটির কণ্ঠস্বর,—জানেন, জলের

ওপর আমার ভীষণ আকর্ষণ! যে-বাড়ীতে থাকি, জল পড়ে ঝিরঝির করে! চান নিয়ে অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া প্রত্যহ। আর এখানে?

বলতে বলতে অদ্ভুত খুশীর বিভায় ঝলমল করে উঠলো মেয়েটির মুখ, বলতে লাগলো,—কী জল! বাথ-টব ভর্তি। ছোট চৌবাচ্চাও আছে। মাথার ওপরে ঝারিও আছে। চান ক'রে যা আরাম এখানে! বিকেলে আমি আবার চান করবো।

ছেলেটি ওর মুখের দিকে তাকালো। মেয়েটির মনে হলো, বোধহয় ছেলেটি ওকে কিছু বলতে চাইছে। সলোমন ট্রে-তে করে চা দিতে এসে বলে গেছে, ছেলেটি নতুন, একটু লাজুক প্রকৃতির। মেয়েটি যেন ওকে ধীরে ধীরে সহজ করে নেয়।

মেয়েটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলো ওর চোখের দিকে চোখ তুলে। তারপরে মৃদু কোমল কণ্ঠে বললে,--কিছু বলবেন?

ছেলেটির দ্বিধা তখনো যায় নি। সে কোনক্রমে বললে, আমার এই জামাটা—।

মেয়েটি এবারে ফিক্ করে হেসে ফেললো। হাসলে ওর গালে সামান্য একটু টোল পড়ে বুঝি। মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো, পিঠভর্তি খোলা ভিজে চুলের রাশি দুলিয়ে দুলিয়ে মেয়েটি বলে উঠলো,—ও হরি! এই কথা? আমি ভেবেছি, না জানি কী! তা ফেলুন না খুলে জামাটা। দিন, খুলে আমার হাতে দিন। টাকা পয়সা আছে নাকি অনেক? ভয় নেই, চুরি হবে না।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো ওর জামাটা, তারপরে কোনো রকমে সেটা ওর প্রসারিত হাতখানার দিকে ফেলে দিয়ে, লুঙ্গিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরের দরজা ঠেলে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল ছেলেটি।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ওর চলে যাওয়া। তারপরে জামাটা টাঙিয়ে রাখলো আনলায়। রেখে এসে ধীরে ধীরে বসলো বেতের ইজিচেয়ারটিতে। বাঁদিকের কোণে তার প্ল্যাস্টিকের নীল চুবড়িটা রয়েছে। ওর মধ্যে থাকে তার ব্যাগ, বই। বইখানা বার করে পড়ছিল এতক্ষণ, এবার সেটা আবার চুবড়িতে তুলে দিলো। যখন সে এই ধরণের কাজে বেরিয়ে আসে, তখন লাইব্রেরী থেকে আনা বই একখানা সঙ্গে তার থাকেই। ইতিহাসের পাতার বাঈজী বেগমদের অবৈধ প্রণয়-কাহিনী পড়তে তার খুব ভালো লাগে। শুধু তার কেন, তার মতো মেয়ে সবারই। বোধহয় লেখকরা তাদের মতো পাঠিকার জন্যই এ-সব লেখে। এ-সব অবৈধ ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রবহমানা হতভাগিনী নারী চরিত্রের সঙ্গে ওদের মতো মেয়েরা অদ্ভুত এক একাত্মভাব অনুভব করে। না, একাত্মভাব বলাটা ভুল হলো। অসামাজিক, অবৈধ আচরণের জন্য যে গ্লানিবোধ ওদের মনের গহনে সঞ্চারিত হতে থাকে, এইসব বাঈজী-বেগম-বাঁদীদের চরিত্রের মধ্যে ওরা নিজেদের আচরণের সপক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে পায়।

মেয়েটির ঠোঁটে ফুটে উঠলো বাঁকা একটু হাসি। ট্রামে বাসে আসতে যেতে যখনই ও আড় চোখে দেখে, কোনো মেয়ের হাতে ঐ সব ঐতিহাসিক রোমাঞ্চের বাঈজী-বেগমদের নিয়ে লেখা ঝক্‌ঝকে মলাটের ছবিওয়ালা বই রয়েছে, তখনই ও বুঝে নেয়, মেয়েটি কী ধরণের।

—আজকাল মনে হয়, পুরুষরাও এটা বুঝতে শুরু করেছে,—মেয়েটি মনে মনে বললে,—ঝুড়িতে বা তার হাতে ঐ ধরণের বই দেখলে, ট্রামে বাসে বহু ব্যাটা-ছেলে কেমন একরকম চোখে তাকায়, চোখে চোখ পড়লে লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, আমাকে 'সুলভ' মেয়ে ভেবে মুচকি একটু হাসে। বহু ব্যাটাছেলে আবার

পিছু নেবারও চেষ্টা করে। কিন্তু আমি কি সত্যিই সুলভ? আমি কি সত্যিই দেহ-ব্যবসায়িনী? না, তা ত নই? তবে আমি কী?

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো,—আমি কী, আমি নিজেই তা জানি না।

ভিতরের দরজাটা ভেজিয়ে দিতে ছেলেটি বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল। ওধারে ছোট্ট একটা করিডোর। তার পাশে বাথরুম ইত্যাদি। সেখান থেকে জল ঢালবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জলের প্রতি মেয়েটির বোধহয় সত্যিকার টান আছে। অমনি তার কানে এসে বাজলো সেই জলের শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তার গতি অন্য দিকে ফিরে গেল। ঠোঁটের কোণে আবার ফুটে উঠলো মৃদু একটু হাসি। মেয়েটি ভাবলো,—ভদ্রলোক ঝারি ব্যবহার না করে বোধহয় চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে গায়ে জল ঢালছেন।

—অতনুবাবু!—মনের খেয়ালে বেশ নামটি সে দিয়ে ফেলেছে কিন্তু ছেলেটির।

অভাবের তাড়নায় টাকা নিতে সে বাধ্য। কিন্তু সকালে এসে সলোমনের ঐ নিভৃত ঘরে বসে থাকতে থাকতে মনটা তার সত্যিই এক ধরণের ভয়ে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। অ্যাংলো-ট্যাংলো আসবে না ত? সলোমন অবশ্য তাকে বলেছিল,—কোনো ডর নেই, তোমার জাতবালাই আসবে।

তারপরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। সলোমন দ্বিতীয়বার চায়ের ট্রে নিয়ে যখন এলো, তখন বলে গেল,—একদম নয়া আদমী, খাপসুরৎ, তোমার দেখে ভালো লাগবে।

শোনামাত্রই তার মনটা হঠাৎ কৌতুকে আর ছেলে-মানুষীতে

ভরে গিয়েছিল। অতি প্রগল্‌ভার মতোই আচরণ করেছিলো সে। নইলে অজানা অচেনা পুরুষের মুখের ওপর টেবিল-ল্যাম্পের আলো ঘুরিয়ে ফেলতে যাবে কেন সে? কেনই বা প্রথম কথা বলতে যাবে নিজে থেকে? কেনই বা হঠাৎ নামকরণ করে বসবে? আসল কথা, নতুন শুনে সে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। বয়সেও ভদ্রলোক খুব তরুণ, গায়ের রঙ শ্যামল হলেও, চেহারার মধ্যে একটা লালিত্য রয়েছে। পুরুষালি চেহারা, স্বাস্থ্য ভালো, অথচ সারাটা মুখে একটা ছেলেমানুষী ভাব মাখানো। বয়ঃসন্ধি-কালে ওকে এ-ভাবে দেখলে নির্ঘাৎ বুঝি ওর প্রেমে পড়ে যেতো মেয়েটি।

কিন্তু এইবার? যখন অতনুবাবু চান সেরে ঘরে এসে ঢুকবে? করার কী থাকবে তখন? বারোটার আগে লাঞ্চ আসছে না। ততক্ষণ কী-সব গল্প করে সময় কাটানো যাবে? অথবা কেউ কোনো কথা বলবে না। মেয়েটি বেগম-বাঁদীদের বই পড়বে, আর ছেলেটি? খুঁজে-পেতে এ-ঘরে একটি বইও পাবে না। করবে কী তখন ছেলেটি?

—'বেশ মজা হবে,'—মেয়েটি মনে মনে বললে,—আমি ইজিচেয়ারে বসে বইয়ের আড়ালেই মুখ ঢাকবো, আর আড়াল থেকে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখবো ভদ্রলোক কী করে!

জল পড়ার শব্দ কী বন্ধ হলো? মেয়েটি কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো। না, শব্দ আর নেই। শেষ হলো বোধহয় স্নান।

হঠাৎ নিজের মনেই আবার হেসে ফেললো মেয়েটি। ওর এক বান্ধবী,—বান্ধবী মানে সেই মেয়েটি, যে থিয়েটার করে বেড়ায়, ফিগার তত ভালো নয় বলে নিজে কাজটা না পেয়ে ওকে গত বছর ঠেলে দিয়েছিল সলোমনের খপ্পরে,—সেই-ই একদিন ওকে

বলেছিল,—এই জানিস, একটা বইয়ে লিখেছে, আওরঙ্‌জেব গামছা পরে চান করছে।

শুনে ভীষণ হেসেছিল ও। সম্রাট গামছা পরে চান করছে শুনলে কার না হাসি পায়? সেই কথা মনে পড়ায় নিজের মনেই হাসতে লাগলো মেয়েটি। টের পেলো না, তার সেই অতনুবাবু দামী মোটা নীলরঙের লুঙ্গিটা পরে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, উর্ধ্বাঙ্গে তোয়ালে, হাতে গেঞ্জি আর প্যান্ট্।

—এখন, কী করবো?

ছেলেটির অপ্রস্তুত ভাব তখনো কাটেনি।

মেয়েটি হাসিমাখা মুখখানি ফেরালো ওর দিকে ওর কথা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে আরও হাসি পেলো ওর। মনে মনেই বললে,—এলেন সম্রাট আওরঙ্‌জেব গামছা পরে স্নান সেরে?

—হাসছেন কেন?

ছেলেটির কথায় মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপরে উঠে দাঁড়ালো। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে ওর হাত থেকে প্যান্ট্ আর গেঞ্জি নিয়ে আল্‌নায় রেখে এলো।

ছেলেটি তখনো অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে বললো,—এখানে আসুন, ড্রেসিং টেবিলে। বাব্বাঃ! মাথায় চুলও রেখেছেন বটে—পুরুষমানুষ হয়ে!

ছেলেটি অনুগত মানুষটির মতো টেবিলে এসে চুল আঁচড়াতে লাগলো। মেয়েটি ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে, আয়নায় ছায়া পড়ছে বুঝি।

সলোমন বলেছিল,—আপনার মানুষের মতো ওর সঙ্গে ব্যবহার করবে। নইলে ওর লজ্জা যাবে না। ও বিলকুল আন্‌কোরা আছে বলে হামার মনে হয়েছে।

সেই কথা মনে পড়লো মেয়েটির। মনে মনে বললে,— আপনার মানুষের মতো ব্যবহার না করে উপায় কী? যা আমি ভেবেছিলাম, সব ঘুরে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, কথা বলবো না, বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাবো, ছেলেটি আর কিছু করবার নেই দেখে নিজে থেকেই এগিয়ে আসবে আমার কাছে, গল্প করতে। আমি বলবো, প্লিজ, ইতিহাস নয়। অর্থাৎ নিজের অতীত-কাহিনী বলবেন না, পারেন ত বর্তমানের কথা বলুন, কিম্বা ভবিষ্যতের।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। মেয়েটি বোধহয় নিজের অগোচরেই মনের মধ্যে একটা অন্ধ আবেগ অনুভব করলো, সে আর এক পা এগিয়ে পিছন থেকে চেপে ধরলো ছেলেটির মাথার ওপর তার চিরুনী-শুদ্ধ হাতখানা।

তারপরে খপ্ করে চিরুনীখানা কেড়ে নিয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করামাত্র মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠলো মেয়েটির। সে মুহূর্তকালের জন্য মুখ নীচু করে সে-ভাবটা সামলে নিলো। তারপরে অল্প একটু হেসে চিরুনীশুদ্ধ হাতখানা রাখলো ছেলেটির মাথার ওপরে, অপর হাতে ওর চিবুকের কাছটা উঁচু করে ধ'রে বড়ো বড়ো ভিজে চুলগুলোকে চিরুনীর শাসনে আনতে লাগলো।

ছেলেটি বাধা দিলো না, আত্মসমর্পিত ভঙ্গীতে চুপচাপ বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত পরে মেয়েটি তার কাজ শেষ করে যখন চিরুনীখানা টেবিলের ওপর রাখলো, তখন মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলো,— তারপর?

মেয়েটি আবার ওর চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখখানা সম্মুখবর্তী আয়নার দিকে ফিরিয়ে দিলো, নীরবে ইঙ্গিত করলো আয়নার দিকে তাকাতে। তারপরে স্নোর কৌটোটা টেনে নিয়ে কিছুটা স্নো বার ক'রে চট্ করে ওর গালে-কপালে আল্‌তো করে লাগিয়ে

দিলো। বললে,—বেশ করে মেখে নিন। তেলাতেলা মুখ আমার ভালো লাগে না দেখতে।

ছেলেটি ওর নির্দেশ পালন করতে নিবিষ্ট হতেই মেয়েটি ওর উর্ধ্বাঙ্গ থেকে ভিজে টার্কিশ তোয়ালেখানা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিলো।

ছেলেটি বিব্রত হয়ে বলে উঠলো,—না না, একী—কী করছেন!

মেয়েটি মুখ টিপে হেসে তোয়ালেটা নিয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। ফিরে এলো কিন্তু পর মুহূর্তেই, বললে,—মেলে দিয়ে এলাম। রোদ্দুর কোথায় ভিতরে? হাওয়ায়-হাওয়ায় যদি শুকোয়!

ছেলেটি আড়ষ্ট হয়ে দুহাতে উর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে বসেছিল। সে দিকে চোখ পড়ায় মেয়েটি অল্প একটু হেসে উঠলো। বললে,—এত যদি লজ্জা, তো বেছে বেছে এ-কাজে আসা কেন?

বলতে বলতে সেই ইজিচেয়ারটায় বসলো গিয়ে মেয়েটি। ছেলেটির মুখে আর কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর ছেলেটি উঠলো, মৃদুকণ্ঠে, যেন ঘরের দেওয়ালকেই প্রশ্ন করলো,—এবার কী করবো?

মেয়েটি আবার তার সেই বইখানা মুখের সামনে টেনে নিয়েছিল। আড়াল না সরিয়েই বলে উঠলো,—বারোটা পর্যন্ত কিছুই করবার নেই।

ছেলেটা আলনার কাছ থেকে ওর প্যাণ্টটা খুঁজে বার করলো, পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করলো, তারপরে মেয়েটির দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো,—আশা করি আপত্তি নেই?

বইয়ের আড়ালটা সরিয়ে মেয়েটি ওর সিগারেটের প্যাকেটটা দেখলো, বললে,—না, আপত্তি কী? খান।

ছেলেটি সিগারেট ধরালো। কয়েকটি টান দেবার পর বলে উঠলো,—আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বো?

মেয়েটি বই বন্ধ করে বললে,—মন্দ কী। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ঘরের সব কড়িকাঠগুলো বারকতক গুনতে পারবেন।

ছেলেটি বললে,—বাস্তবিক। খুবই বিশ্রী লাগছে।

মেয়েটি মুচকি হাসলো, বললে,—কী আর করবেন বলুন? রাত ন'টা-দশটার আগে মুক্তি পাচ্ছেন না।

—তা' ত জানি!—ছেলেটি বললে,—কিন্তু এতক্ষণ সময়টা কাটাই কী করে?

মেয়েটি ছদ্মগাম্ভীর্যে বলে উঠলো,—যা করে সবাই কাটায়।

—মানে!

মেয়েটি বইটা টেবিলে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো ইজি-চেয়ারে, বললো,—আচ্ছা পুরুষমানুষ ত মশাই আপনি? বন্ধ ঘর; ঘরের মধ্যে জ্বলজ্যান্ত একটি যুবতী মেয়ে বসে রয়েছে,—আর আপনি কী করে সময় কাটাবেন ভেবে পাচ্ছেন না?

ছেলেটির কান দুটো গরম হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি পিছন থেকে প্রগলভার মতোই বলে উঠলো,—হ্যাঁ, পিছন ফিরেই থাকুন, যতক্ষণ না আমি এদিকে ঘুরতে বলি।

ছেলেটি স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো,—ও অমন সপ্রতিভের মতো কথা না বললে আমি বোধহয় এতোটা আড়ষ্ট বোধ করতাম না। এতটা গায়ে-পড়া ভাব দেখলে সাধারণভাবে একটা বিতৃষ্ণা আসাই স্বাভাবিক, কিন্তু তা' ত আমি অনুভব করছি না! ওর চেহারায় আর ব্যক্তিত্বে এসবই বুঝি মানিয়ে যাচ্ছে!

—হ্যাঁ, এবার ফিরুন।

ফিরে কিন্তু কোনো বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়লো না

ছেলেটির। এটুকু দেখলো, শাড়ীর আঁচলটা আরও ভালো ক'রে, আরও নিবিড় ক'রে গায়ের ওপর টেনে দিয়েছে সে শুধু।

—আপনি বস্থন অতনুবাবু, আমি একটু জল খেয়ে নি। আপনি খাবেন ?

—না।

মেয়েটি এবার ওর দিকে পিছন ফিরে ঘরের কোণে চলে গেল জলের কুঁজোর কাছে। পাতলা নীল শাড়ীটায় পিঠ ঢেকে রেখেছে আগাগোড়া। শাড়ীর আবরণ ভেদ করে বক্ষ-বন্ধনীর ফিতেটা দেখা যায় স্পষ্ট ক'রে। আর দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলো ছেলেটি। গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলেছে বুঝি : ঘরে ফ্যান ঘুরলেও গ্রীষ্মকালের তাপটা যাবে কোথায় ?

ছেলেটি সিগারেট টানতে টানতেই বিছানার ওপর গিয়ে বসে পড়লো। খুব নরম নয় বিছানা, তবে যা কিছু শয্যা-উপকরণ, তা সবই পরিষ্কার,—ধোপ-দুরস্ত, এটা বোঝা যায়।

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আধাআধি এসেছে মাত্র, কিন্তু তবু সেটাতে আর টান দিলো না ছেলেটি, হাত বাড়িয়ে মেঝেতে পোড়া দিকটা ঘষে আগুন নিভিয়ে অদূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

ও-দিকে কাঁচের গেলাসে জল ঢেলে পুরো গেলাসটা শেষ করে ঠক্ করে সেটা রেখে ওর দিকে ধীর পায়ে হেঁটে আসতে লাগলো মেয়েটি।

এসে, হাঁটু মুড়ে ওর কাছে বসে পড়লো। বললো,—শুয়ে পড়ুন না অতনুবাবু ? মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো ?

—ছিঃ !

মেয়েটি বলে উঠলো,—ছিঃ কেন ? কল্পনা করুন না, অনেক—অনেকদিন পরে শ্বশুরবাড়ীতে এসে জামাই-আদর পাচ্ছেন। আর,—যাকে আপনি বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখে দিয়েছিলেন,

খোঁজখবরও নিতেন না,—সেই আপনার তরুণী বউটি আপনাকে অনেক—অনেকদিন পরে কাছে পেয়ে একটু সেবা করার সাধ মিটিয়ে নিতে চায়।

বলতে বলতে, কী আশ্চর্য, শেষের দিকে মেয়েটির গলা ধরে এলো। সে হঠাৎ মুখ ফেরালো।

অতনু একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলো ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললে,—আপনার সিঁথিতে সিঁদুর, স্বামী আছে নিশ্চয়?

চট্ করে ওর দিকে মুখ ফেরালো মেয়েটি, চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—কোনো 'ইতিহাস' নয়, প্লিজ্।

তারপরেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, ঠোঁটের ওপর টেনে আনলো মৃদু হাসির রেখা, বললো,—সলোমনসাহেব এখনো একবার খোঁজ নিতে এলো না কেন, তাই ভাবছি। দেখবেন, খানিকক্ষণ অন্তর অন্তরই ও ঘুরে ঘুরে আসবে, জিজ্ঞাসা করবে,—'কী? হলো, তোমাদের ভাব-সাব?'

—কেন?

মেয়েটি বললে,—বারে, সেইজন্যই ত এইসব ব্যবস্থা!

পরক্ষণেই ফিক্ করে হেসে ফেললো সে, বললে,—এমন জামাই-আদর আর পাবেন না! হাতে টাকাও গুঁজে দিয়েছে, তরুণী বউও দিয়েছে পুরো একটি দিনের জন্য।

অতনু এবারে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লো। মেয়েটি পাশে বসে ওকে আড় চোখে লক্ষ্য করতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো, সলোমন একটুও বাড়িয়ে বলে নি, মানুষটি সত্যিই সুপুরুষ।

সময়টা কাটছিল চুপচাপ। কয়েক মুহূর্ত পরে মেয়েটিই নীরবতা ভঙ্গ করলো। মৃদুকণ্ঠে বললো,—কী? সেবা করবো? পা টিপে দেবো?

—না, ছেলেটি বললে,—আপনি যতটা গোবেচারা ভাবছেন আমাকে, আমি ঠিক ততটা নই।

—ননই ত!—মেয়েটি বললে,—গোবেচারা লোক কি এসব কাজে আসে?

—টাকার জন্য আসে না?

মেয়েটির মুখখানা বিমর্ষ দেখালো, অন্যদিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে সে বললে,—তা' অবশ্য। আজকের দিনে টাকার জন্য মানুষ যে-কোনো প্রফেশনে আসতে পারে। দোষ দেওয়া যায় না।

অতনু কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে এবার, সোজাসুজি। মেয়েটি সেটা অনুভব করেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

অতনু একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললে,—আপনি এখানে আগে অনেকবার এসেছেন, তাই না?

ওর দিকে চট্ করে মুখ ফিরিয়ে উত্তেজিত এবং উচ্চকণ্ঠেই মেয়েটি বলে উঠলো,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ধীরে ধীরে অতনু বললে,—ভাবভঙ্গী দেখে তাই মনে হয়।

মেয়েটি হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে, বললে,—ভেবে ছিলেন কী আমাকে? আন্‌কোরা? মোটেই নয়।

হাসতে হাসতেই আবার অন্যদিকে মুখ ফেরালো মেয়েটি, হঠাৎ তার চোখের পাতা ভিজে উঠলো। ছেলেটির অগোচরে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেললো সে। অতনু তখন ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কড়িকাঠের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

॥ ৫ ॥

মেয়েটি অপাঙ্গে ওকে একবার দেখে নিয়েই ভাবতে লাগলো,—ছেলেটি বাস্তবিকই 'আন্‌কোরা'। মায়া হয়। আমিও যে ওর মতো নতুন,—এটা ওর বোঝবার ক্ষমতা নেই। আমি যে ভিতরকার মনোবিকলন অথবা নার্ভাসনেস্‌ কাটাবার জন্য ওর সঙ্গে নির্লজ্জার মতো ব্যবহার করছি,—সেটা বিশ্লেষণ করে দেখবার মতো পরিপক্ক মন ওর নয়। কিম্বা, আজ ওর মনের সে-অবস্থাও নেই, কারণ, ও নতুন। আমি অবশ্য পুরাণো। আমি এখানে এসেছি। এ ঘরেই এসেছি বহুবার। এই সলোমন সাহেবকে আমি চিনি আজ বছরখানেক হলো। কিন্তু তখন এসেছি ওর কাছে অন্য কাজে। এই ঘরেই উজ্জ্বল আলোয় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সলোমন ছবি তুলেছে আমার। আগে আগে নানান পোশাক পরিয়ে তুলতো। শাড়ী পরিয়ে, কিম্বা, শাড়ীর আঁচল ফেলে দিয়ে। তারপরে গাউন পরিয়ে। ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হয়েছিল সলোমন। আমাকে সাঁতারের সংক্ষিপ্ত পোশাকও পরতে হয়েছিল। টাকা পেতাম অবশ্য। টাকা না পেলে আমার সংসার চলবে কেমন করে? তারপরে কখন একদিন আমার শরীর থেকে সব পোশাক খুলে গেল। আমি তখন ঐ ড্রেসিং-টেবিলে বসে মুখে খুব পেণ্ট করে নিতাম। ভুরু দুটো মোটা করে এঁকে দিতাম। লিপস্টিক দিয়ে ঠোঁট আঁকতাম পুরু করে। আর, আমার এই পিঠভর্তি একরাশ চুল ক্লিপের সাহায্যে ছোট করে নিতাম। সিঁথির ধরণও করে দিতাম

অন্যরকম। ছবি উঠলে দেখা যেতো, আমি একেবারে অন্য মেয়ে। অবিকল ফিরিঙ্গী মনে হতো।

সলোমন বুড়ো হলেও পুরুষমানুষ, ওর সামনে ওভাবে দাঁড়াতে প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করতো। কিন্তু গুণ আছে সাহেবের। কখনো জবরদস্তি করতো না। বলতো,—ঠিক আছে, আজ থাক, কাল হবে।

আরও একটা কথা। বুড়ো কখনো তার সঙ্গে দোষণীয় কোনো ব্যবহার করেনি। আসলে বুড়োর সে সব বদ্ মতলব নেই। বলতো,—তুমিও পেটের জন্য এসেছো, আমিও এসব করছি পেটের জন্য। কী করবো বলো? সিনেমার ক্যামেরাম্যান ছিলাম প্রথম জীবনে, ইণ্ডাস্ট্রি রসাতলে গেল, আমিও কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত খুললাম এই স্টুডিও। প্রথম প্রথম মন্দ চলতো না, পরে ব্যবসা একেবারে পথে বসলো। বাইরের ঝক্‌ঝকে দোকান দেখে এই গলির মধ্যে কে আর আসবে বলো? এখানকার এস্টাব্লিশমেণ্ট্ চালানো সোজা ব্যাপার নয়। তাই এই ব্যবসা ধরেছি।

ভাবতে ভাবতে মেয়েটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো, বললো,—না, দোষ দেবার কিছু নেই।

অতনু অবাক হলো বুঝি। বললে—কী বলছেন?

মেয়েটিও একটু চমকে উঠলো, বললে—অ্যাঁ! কিছু বললাম বুঝি?

তারপরেই ম্লান একটু হেসে,—তা, হবে। মনে মনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ সেটা এক একসময় জিভে এসে যায়। এই আমার এক রোগ!

অতনু বললে,—রোগটা কিন্তু ভালো।

—মনের কথা জেনে ফেলা যায় বুঝি?—মেয়েটি বললে,—তা'

তো বুঝলাম। কিন্তু রোগটা যার ভালো, সেই মানুষটিকে ভালো লাগছে কী?

—লাগছেই ত।

মেয়েটি হাসলো। মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হলো! বললে,—ছাই। একটা নামও ত দিতে পারলেন না এতক্ষণ!

অতনু বললে,—ঠিক এই কথাটাই এতক্ষণ ভাবছিলাম, বিশ্বাস করুন। শীলা, নীলা, প্রতিমা,—কতো কী যে ভাবলুম, তার ইয়ত্তা নেই।

—এতো ভাববার কী আছে?—মেয়েটি বললে,—আমি কি ভাবতে সময় নিয়েছিলাম? যে-ই মনে হলো, অমনি বলে ফেললাম। বলি, নভেল-টভেল পড়া নেই?

—নভেলের মেয়েদের সঙ্গে আপনার ঠিক মিলছে না!

সর্বনাশ—! মেয়েটি বললে,—একটা নভেলের নায়িকা হবার যোগ্যতাও আমার নেই?

—সে-কথা নভেল-লিখিয়েরাই বলতে পারে,—অতনু বললে,—আমি ঠিক লাগসই নাম খুঁজে পাচ্ছি না!

—আরও চিন্তা করুন, পেয়ে যাবেন।

ওরা কথা বলছে, ঠিক এই সময় ভারী পর্দাটা ঠেলে সলোমন-সাহেব এসে ঢুকলো, পুরু ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা টেনে এনে বললো,—কী? হলো ভাব-সাব?

কলরব করে হেসে উঠলো মেয়েটি। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল অতনু। তার বাহুতে হাতের আঙুলগুলো ছুঁইয়ে দিয়ে বলে উঠলো,—হয়েছে বই কী!

তারপরেই অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে,—কীগো, হয় নি ভাব-সাব? বলো না সাহেবকে?

সাহেবের মুখখানা খুশীতে ভরে উঠলো, বললো,—সাবাস! আর কিছু এখন চাই তোমাদের ?

মেয়েটি বললে,—না।

সাহেব তখনো দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির দিকে তাকালো সাহেব, কী একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে,—মলি, তুমি যা চেয়েছিলে, তা ঐ আলমারীতে আছে। দরকার মতো নিয়ে নিও।

—আচ্ছা।

সাহেব আর দাঁড়ালো না। 'উইস্ ইউ গুড্ লাক্' বলে, পর্দা সরিয়ে চলে গেল।

—মলি ?—অতনু প্রশ্ন করলো,—মলি আপনার নাম ?

চোখ দুটো কৌতুকে ঝলমল করছে মেয়েটির। বললে,—আজ্ঞে না। ওটা সাহেবের দেওয়া নাম। ও-নামে আপনাকে ডাকতে দেবো না। দয়া করে নামকরণ করুন, জাঁহাপনা।

—করেছি।

—কী ?

—জাহানারা।

মেয়েটি ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো,—দূর! অতনুর পাশে জাহানারা! বড্ড বাজে টেস্ট ত আপনার!

অতনু বললে,—আবার 'আপনি-আজ্ঞে' কেন ? সাহেবের সামনে ত বেশ 'ওগো' 'হ্যাঁগো' চলছিল!

মেয়েটি বললে,—ওটা না করলে চলে ? শত হলেও একটা দিনের মনিব। অনেক টাকা দেবে।

—আলমারীতে কী আছে বলছিল ?

মেয়েটি বললে,—সেটা আপাতত আপনার জেনে দরকার নেই।

—কেন ?

—শক্ পাবেন।

—তবু শুনি ?

মেয়েটি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ওর চোখের দিকে তাকালো, তারপরে বললো,—রম্।

—'রম্' মানে ?

খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো মেয়েটি, বললে,—সাহেব খুব কাপ্তান পাকড়েছে যা হোক ! রম-ও চেনেন না ? মদ।

যেন আঁতকে উঠলো ছেলেটি, বললো,—সে কী ! খান নাকি ?

হাসি থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে। মুখ নীচু করলো। মুখের ভাব একটু যেন কঠিন হয়ে উঠলো। তারপর বললে,—সত্যি কথা শুনতে চান ? আজ যদি ঠোঁটে ছোঁয়াই, ত, দ্বিতীয়বার ছোঁয়াবো।

অতনু ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ বুঝি-বা অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলো। কিছু বললো না।

মেয়েটি আবার তার চিন্তার গহনে অবতরণ করলো ঃ—প্রথম যেদিন ঐ ছাইপাঁশ সে মুখে ঢেলেছিল, সেদিন না ঢেলে উপায় ছিল না। এই ঘরেই। উজ্জ্বল আলো। ক্যামেরা। সে আর সলোমন সাহেব। সাঁতারের সংক্ষিপ্ত পোশাক-এর পালা শেষ হয়ে গেছে,—এবার সব পোশাক ছুঁড়ে ফেলারই লগ্ন এসেছে। দিন-কতক চেষ্টা করেও সে পারে নি। সলোমন তার ভাব-গতিক দেখে তাকে ছুটি দিয়েছে। কিন্তু, আর কতো ছুটি তার দরকার ? সাহেবই কথাটা তাকে বললে। ও আর আপত্তি করলো না। ভীষণ ঝাঁঝ আর উগ্র গন্ধ। কিন্তু তারপরেই কান দুটো যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। অসহ্য গরমও লাগছিল। ঘাম দিচ্ছিল। ব্যস। এরপরে সহজ হয়ে এসেছিল ব্যাপারটা।

—আর তারপর ?—মেয়েটি নীরবেই কথা বলতে লাগলো নিজের সঙ্গে,—লজ্জা-টজ্জা কোথায় গেল ? ক্যামেরার সামনে

পোশাক খুলে দাঁড়াতে আর আমার বাধো-বাধো ঠেকে না। আমি হয়ে গেলাম সাহেবের আর্ট-এর মডেল।

—কী ভাবছেন?

মেয়েটি একটু চমকে উঠলো। অতনু আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ও মুখ ফেরাতেই সে বলে উঠলো,—মনে ধ'রেছে একটা নাম।

মেয়েটি বললো,—কী?

—তনিমা।

—বাঃ! মেয়েটি বলে উঠলো,—অতনু-তনিমা, বেশ সুন্দর শোনাচ্ছে ত?

—পছন্দ হয়েছে?

—খু—ব।

—ছোট করে 'তনু' বলেও ডাকতে পারি।

মেয়েটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললে,—অতনুর তনু—মন্দ কী?

ছেলেটি ওর হাতের ওপর হাতখানা রাখলো। বুঝি বা এই স্পর্শে একটু চমকেই উঠলো মেয়েটি, নিজের অজ্ঞাতে মুহূর্তেই বুঝি ওর দিকে আর একটু দেহটা এগিয়ে দিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শাসন করলো নিজেকে। তাড়াতাড়ি বললো,—শুয়ে পড়ো শীগ্‌গির। আমি তোমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেটি ওর 'তুমি'-সম্বোধনের মাধুর্য কয়েক মুহূর্ত ধ'রে উপভোগ করলো নীরবে, তারপরে কী যেন একটা বলতে গেল, কিন্তু—

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওর মুখ থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিলো। মেঝের ওপর ঠুসে ধরে আগুনটা নিভিয়ে ফেলে দূরে ছুঁড়ে দিলো। বললো,—সইতে পারি না এইসব সিগারেটের গন্ধ।

—বারে, বললে না কেন আগে ?

—বললেই মশাই শুনতেন অমনি! পুরুষমানুষদের ঢং খুব জানা আছে।—মেয়েটি বললে,—জোরজার করে কেড়ে না নিলে ওরা কিছু ছাড়তে চায় না। আমি তাই কেড়ে নিলুম, বুঝলে? নাও, শীগ্গির শুয়ে পড়ো।

বলেই ওর বুকে অল্প একটু ধাক্কা দিলো মেয়েটি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো অতনু। আর তনিমা করলো কী, উঠে গিয়ে বসলো ওর শিয়রের কাছে। ওর চুলের ওপর হাত রেখে বলে উঠলো,—কাঁচি দিয়ে কঁ্যাচ-কঁ্যাচ করে কেটে ফেলতে হয়। বেটাছেলে এত চুলও রাখে! ফ্যানের হাওয়ায় এখনো ভালো করে শুকোয় নি। ভিজে ভিজে। দেখ?

—দেখে কাজ নেই।

মেয়েটি ওর চুলে হাত দিয়ে আঙুলগুলোকে চিরুনীর মতো ব্যবহার করতে লাগলো। ওকে নীরব দেখে চটুলকণ্ঠে বলে উঠলো,—ভালো লেগেছে না? এ রকম সেবা করে বাড়ীতে,—বউ?

অতনু ওর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলো,—নো ইতিহাস, প্লীজ।

—আই অ্যাম্ সরি,—মেয়েটি বললে,—আমারই কথা দিয়ে আমাকে পাল্টা মারলে ত?

—একে প্রহার বলে না।

—তবে এটা কী?

অতনু বললে,—মনে করিয়ে দেওয়া, যে-অতীতকে মানুষ পরিহার করতে চায়, সে অতীত নিজের অজ্ঞাতেই বারবার এসে মনের গহনে উঁকি দিতে চায়।

হাত থেমে গেল মেয়েটির। একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে

বললে,—নভেলটভেল বেশ পড়া আছে দেখছি। কথাটা বেশ বললে কিন্তু, অথচ উপায় নেই। অতীতকে বর্তমানের কোলে টেনে আনলে অশান্তির আর শেষ নেই। কে আর ইচ্ছে করে শ্মশানের চিতা দেখতে চায় বলো?

ছেলেটি চুপ করে রইলো।

তনিমা বলতে লাগলো,—রোমান্টিসিজম্ একটা বড় নেশা জানো ত? এই নেশায় যদি ডুবে থাকতে পারতে ত খুব ভালো হতো। জানি, আমরা দুজনে রোমান্স করতে আসিনি, বরং পেটের দায়ে এক নগ্ন বাস্তবের সামনে এসেছি। তবু পারা কি যায় না, ক্যামেরার চোখকে ফাঁকী দিয়ে, সলোমনদের ফাঁকী দিয়ে, এই একটা দিন ধরে সময়ের কাছ থেকে কিছু রোমান্সের সোনা চুরি করে নিতে? ছাই হয়ে যাক্ আমাদের অতীত, মুছে যাক্ আসন্ন গ্লানির স্মৃতি,—আমরা দুজনে ক্ষণিকের স্বর্গ কি গড়ে তুলতে পারি না?

চুপ করে শুনছিল অতনু। ওর কথা শেষ হতেই, কপালের ওপরে রাখা ওর হাতখানা চেপে ধরলো সে, বললো,—নভেল টভেলের ভাষা শুধু আমারই মুখস্থ নেই, আরও একজনের আছে দেখছি।

তনিমা বললে,—না, ঠিক তা নয়,—যা বললাম, এ আমার মনের কথা।

অতনু ওর হাতখানা বুকের কাছে টেনে আনলো, বললো,—আমাদেরও মনের কথা তাই। মুখে স্বীকার করি না, কিন্তু মনে মনে জানি, জীবনের পথে রোমান্সকে অস্বীকার করা যায় না।

তনিমার হাতখানা ওর হাতের মধ্যে বন্দী করা আছে, ছাড়িয়ে নিচ্ছে না সে। চোখের দৃষ্টি কোমল, মুখখানা নত করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

অতনু অপর হাতটি দিয়ে মাথার বালিশটা সরিয়ে দিলো, তারপরে মাথাটা উঠিয়ে দিলো ওর কোলের ওপর। তনিমা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দুখানি হাত জড়ো করলো ওর মাথায়।

—রাগ করলে ?

—কেন ?

—বালিশ সরিয়ে দিলাম, তোমার প্রশ্রয়ের সুযোগ নিলাম।

হাসলো মেয়েটি, বললো,—বেশ কথা বললে কিন্তু! একটি মেয়েকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমি তো যা খুশী করতে পারো।

অতনু বললে,—জানি। কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার ?

—বুঝবে না।

—বুঝবো। বলো না ?

অতনু বললে,—রোমান্স-টোমান্সের কথা বলে তুমিই সুযোগ করে দিয়েছো। জোর-জবরদস্তি—

ও থেমে যেতেই মেয়েটি অল্প একটু হাসলো, মৃদুকণ্ঠে বললে,—দরকার কী ? কী চাও, বলো না ?

বলতে বলতে মেয়েটি হঠাৎ মুখ নীচু ক'রে—

আশ্চর্য হিমশীতল একটা স্পর্শ তার ঠোঁটের ওপরে। অবশ্যই চকিতের জন্য। ছেলেটি ধড়মড় করে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি। একটু বিস্মিত হয়েই তাকালো মেয়েটির দিকে।

—কী হলো ?

ছেলেটি কথার উত্তর না দিয়ে নীরবেই উঠে দাঁড়ালো। সিগারেট ধরালো। নিশ্চুপে এগিয়ে গিয়ে বসলো টেবিলের সামনে, চেয়ারটায়।

মেয়েটি বিছানার কাছেই ঠায় বসে আছে। বসে বসেই সে

দেখছে ছেলেটির কার্যকলাপ। ঠোঁটের কিনারে অল্প একটু হাসি, চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিমিলি।

হঠাৎ সে হেসে ফেললো, বললো,—বাব্বাঃ! রাগ বটে পুরুষের!

অতনু বললে,—কিন্তু কী দরকার ছিল— ?

মেয়েটি আবার হেসে উঠলো, তারপরে ধীরে ধীরে সে নিজেকে টেনে এনে গড়িয়ে দিলো বিছানায়। ছেলেটির চোখের সামনেই। আঁচলটা তার সরে গেল। এবং সরে যাওয়া আঁচলটা সে তুলে নিলো না যথাস্থানে। পাশ ফিরে শুলো শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ করে। পিঠটা তার নিরাবরণ, বক্ষ-বন্ধনীর শাদা ফিতেটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, নরম শরীরের ওপর যেন কেটে-কেটে বসে গেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে গেল।

অতনু সিগারেটটা শেষ করলো কয়েকটা ঘন ঘন টান দিয়ে। তারপরে যেন দেওয়ালকেই সম্বোধন করছে, এমনভাবে বলতে লাগলো,—আমি জানি, রোমান্স কথাটা কতো শক্ত। চেষ্টা করলেই হয় না। আমরা যা করতে এসেছি, তার জন্য প্রস্তুত করলেই হতো নিজেদের! অন্য জিনিস চাওয়া কেন? চাইলেই কি পাওয়া যায়? মনে করলেই কি দেওয়া যায়? না, ওটা আমাদের কারুরই হাতে নেই।

অদূরে বিছানায়, মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে ওর দিকে তাকালো, বললে—অমন করে বলছো যে? কী চেয়েছি আমি?

অবাক হয়ে অতনু দেখলো; মেয়েটির চোখে জল, গলাটা ধরা-ধরা। ও-পাশ ফিরে তাহলে এতক্ষণ কাঁদছিল নাকি?

অতনু তার সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালো, শূন্য দেওয়াল-টাকেই বুঝি বললে,—কেন কাঁদছো বুঝতে পেরেছি! তাহ'লে

নিজেই বুঝতে পেরেছো, আমরা পরস্পরকে ফাঁকী দেবার চেষ্টা করছিলাম!

মেয়েটি উঠে বসলো। সারা পিঠময় খোলা চুল এলিয়ে পড়লো, বুকের ওপরেও দু-একগোছা এসে পড়েছে, আঁচলটা লুটোচ্ছে বিছানার ওপর। বললে,—ফাঁকী ছাড়া আবার কী? আমরা কি পরস্পরের কাছে প্রেম চেয়েছিলাম?

—না, তা ঠিক নয়,—অতনু বললে,—তবে, তুমি রোমান্স-টোমান্স কী সব বলছিলে না?

মেয়েটি বুকের কাছ থেকে চুলের গোছা পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে বললে,—না বলে করবো কী? আমার কী রকম ভয় করছে তা তুমি জানো?

—ভয়?—ছেলেটি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো।

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়ালো, ভূলুণ্ঠিত আঁচলটা ঠিক করে নিলো, তারপরে ওর চেয়ারের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললে,—ভীষণ ভয়। সেটা কাটাবার জন্যই ত আবোল-তাবোল বক্‌ছি।

—কিন্তু ভয়টা কিসের?

মেয়েটি চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো। হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরের পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো কুঁজো সলোমন, তার হাতে একটা বড়ো চৌকো বাক্স। সেটা সে বিছানার কোণের দিকে নামিয়ে রেখে ওদের দিকে সরে এলো, পুরু ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি, বললে,—বাক্সটা ধ'রো না।

ছেলেটি বললে,—কী আছে ওর মধ্যে?

কুঁজোসাহেব বললে,—একটা ক্যামেরা। একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। খুব দামী। কিন্তু তোমাদের খবর কী? বারোটা বাজে। খাবার আনবো?

—আনো।

—ভেরি গুড্।

বেরিয়ে গেল কুঁজোসাহেবটা। মেয়েটা ধীরে ধীরে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসলো। কেমন যেন ক্লান্ত ওর ভঙ্গী। স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে,—ক্ষিদে পেয়ে গেছে বুঝি?

ছেলেটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সরাসরি আবার প্রশ্ন করলো,—বললে না, ভয়টা কীসের?

—পরে বলবো। ভালো লাগছে না কথা বলতে।

—বেশ।

ছেলেটি সিগারেট ধরালো আরেকটি। কারুর মুখে কথা নেই। মেয়েটি চোখ বুজে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে ইজিচেয়ারে।

ওর সিগারেটও শেষ হলো, আর বড়ো ট্রে-তে করে খাবার নিয়ে প্রবেশ করলো কুঁজোসাহেব। একটা ট্রে রেখে আর একটা নিয়ে এলো। বললে,—টেবিলটা ছোট, নীচে বসে খাও।

ছেলেটি বললে,—হোটেল থেকে আনানো বুঝি?

কুঁজো বললে,—হ্যাঁ।

—তা, তুমি নিজে আনছো যে? বয়-টয় নেই।

চোখ কপালে তুললো সলোমন, বললে,—সর্বনাশ! এসব ব্যাপার কাউকে জানতে দিতে আছে? আমাদের তিনজনেরই হাতে দড়ি পড়বে।

ছেলেটি ভাবলো,—তাও বটে।

—নাও, খেয়ে নাও। আমি মিনিট কুড়ি পরে আবার আসছি।

ব'লে চলে গেল সে।

অতনু তাকালো তনিমার দিকে, বললে,—খাবে না?

চোখ খুললো মেয়েটি, বললে,—না।

—কেন?

—ইচ্ছে নেই।

অতনু বললে,—সাহেবকে বললে না কেন কথাটা ?

—কী বলবো ? খিদে নেই ?

—তবে ?

মেয়েটি ভ্রূ-ভঙ্গী করে বললে,—কী তবে ? খিদে নেই এই মিথ্যে কথাটা বলবো কেন ? ইচ্ছে নেই বলেছি, খিদে নেই বলিনি।

অতনু অল্প একটু হাসলো, বললে,—ও, রাগ !

তনিমা উত্তর দিলো না, চোখ মেলে শুধু ছেলেটির কার্যকলাপ দেখতে লাগলো। মেঝের ওপর খাওয়ার আয়োজন করলো ছেলেটি, পাশাপাশি দুটি বড়ো প্লেট্—বিরিয়ানী সাজানো। আর তার চারপাশে ছোট ছোট প্লেট্। কাঁচের গেলাসে জল পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে এলো সে।

তারপরে, একটি প্লেটের সামনে বসে পড়ে মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—নিন, আসুন।

মেয়েটি অলসভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে এসে বসলো তার প্লেটের সামনে, কিন্তু মুখে কিছু না তুলে হাত গুটিয়ে বসে রইলো।

ছেলেটি খাওয়া শুরু করেছে। মুখ তুলে বললে,—আরে. হলো কী তোমার ?

—ঘুম পাচ্ছে।

—বেশ ত, খাওয়ার পর ঘুমোও না ?

—ভালো লাগছে না।

—আচ্ছা মানুষ ত ! ছেলেটির কণ্ঠস্বরে এবার একটু উষ্ণতা প্রকাশ পেলো, বললো—ওসব রাগ-টাগের কোনো মানে হয় ? আমি কে তোমার, অ্যাঁ ?

মেয়েটি চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বলে উঠলো,—ও, কেউ নও বুঝি ? বেশ।

আর দ্বিরুক্তি না করে খাওয়ায় মন দিলো সে।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে মেয়েটি গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বললে,—ঘুম পাচ্ছে, আমি শুয়ে পড়লাম।

ছেলেটি কোনো কথা না বলে আশ্রয় করলো ইজিচেয়ার। ও-পাশ ফিরে সত্যি সত্যি বুঝি ঘুমিয়ে পড়লো তনিমা। অতনু হাত বাড়িয়ে ওর ঝুড়ি থেকে ওর বইটা বার করে পড়ার চেষ্টা করলো। পড়লোও কয়েক পৃষ্ঠা। শেষ পর্যন্ত ওরও চোখ জড়িয়ে আসতে লাগলো ঘুমে।

॥ ৬ ॥

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন চারটে বেজে গেছে। টেবিলে ধূমায়িত দু-কাপ চা। তনিমা চুল বেঁধে বিচিত্র এক খোঁপা করেছে, কপালের ওপর চুলের বেশ খানিকটা অংশ নামিয়ে দিয়ে। পরণে শাড়ী নেই। সায়ার ওপরে লম্বা একটা মেয়েলী ড্রেসিং গাউন। মুখে ঘন প্রসাধন, ঠোঁটে লিপস্টিক, ভুরু দুটি মোটা করে আঁকা. চোখে কাজলের রেখা। সত্যিই, মুখখানা অন্যরকম হয়ে গেছে। সেই মেয়ে বলে চট্ করে চেনে কার সাধ্য ?

ওকে অবাক হয়ে অমন করে তাকাতে দেখে হাসছিল মেয়েটি মুখ টিপে টিপে। বললে,—সাহেব এসে এইমাত্র চা দিয়ে গেল। আর সে আসবে একেবারে সন্ধ্যের পর। একটা চাবুক দিয়ে গেছে, দেখেছো ?

অতনু সবিস্ময়ে দেখলো, বিছানার ওপরে একটা ছোট্ট চাবুক পড়ে আছে সাপের মতো।

—কী হবে ওতে !

—কে জানে!—মেয়েটি বললে,—সলোমনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললে,—দরকার আছে। কথা না শুনলে আমাদের মারবে-টারবে বোধহয়।

অতনু আর কথা না বলে একটু চিন্তিত ভঙ্গীতেই বাথ্রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটি চেয়ারে বসলো। ভাবতে লাগলো,—এ ড্রেসিং-গাউনটা আগেও সে পরেছে। বেশ দেখতে কিন্তু জিনিসটা!

হঠাৎ নিজের মনেই ফিক্ করে হেসে ফেললো, বললে—লোকটা অদ্ভুত। আমি বুঝি ঘুমিয়েছিলুম? আমাকে ঘুমন্ত মনে করে নিজেই শেষে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি। ' কিন্তু এরপর? এরপর কী করবে তুমি?

ভিতরের দরজায় খুট্ করে শব্দ। ছেলেটি ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। এসে বসলো ইজিচেয়ারে। নীরবেই চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে লাগলো।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি শেষ করলো তার চায়ের কাপটা। বললে,—সময় আর বেশী নেই কিন্তু।

—কী করতে হবে আমাকে এখন?

মেয়েটি বললে,—ড্রেসিং টেবিলে যাও। মুখে রঙ-টঙ দিয়ে গোঁফ-টোফ এঁকে চেহারাটা বদলে নাও।

অতনুর মুখের চোয়ালটা দৃঢ় ও কঠিন দেখালো, গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে,—না। চেহারা বদ্লাবার দরকার নেই।

—কেউ যদি চিনে ফেলে?

—চিনুক।

মেয়েটির মুখখানাও গম্ভীর হলো, কী যেন চিন্তা করলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে,—সেটা ভালো হবে কী? ধরো, বলা ত

যায় না, একদিন তোমার বউয়ের চোখে পড়ে গেল জিনিসটা—! মানুষের শ্রদ্ধা হারানো যে কী মর্মান্তিক!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো অতনু,—বউ থাকলে ত এসব কথা উঠবে!

হতবাক্ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো তনিমা কিছুক্ষণ, তারপরে বললে,— বউ নেই মানে! তুমি না তখন বললে, তুমি বিবাহিত!

অতনু ওর প্রশ্নের ধরণে হঠাৎ কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল. উঠে দাঁড়ালো, মুখখানা পাংশু দেখাচ্ছে, ওর দিকে একটু এগিয়ে এসে বললে,—আমি বিবাহিত নই, আমি কখনো মেয়েদের সঙ্গে তেমন করে মিশি নি পর্যন্ত! শুধু প্রচণ্ড অভাবের দরুণ—! মানে, মা-ভাই-বোন—! আমি এখন কী করবো বলতে পারো?

মেয়েটি মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে দুহাতে মুখ ঢাকলো, চট্ করে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

অতনু ওর প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আবার বলতে লাগলো,—তুমি তখন বলছিলে, তোমার ভয় করছে। আমার নিজেরও কি ভয় করছে কম? আমি পারবো না, আমি চলে যাবো। কিন্তু সাহেবের টাকা নিয়ে আমি যে সব খরচ করে ফেলেছি! তা ছাড়া, আমার আরও অনেক টাকার দরকার। ছ'মাসের বাড়ীভাড়া, মুদি, রেশন,—নাঃ! আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো!

তনিমা ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরে দাঁড়ালো। ওর চোখের দিকে তাকালো, বললে,—আমার অবস্থাও তাই। একটি মেয়ে আছে আমার, বছর সাতেকের।

বলতে বলতে গলাটা ধরে এলো। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সে বলতে শুরু করলো,—তাকে বোর্ডিং-এ রেখেছি। তার বাপের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আমার বছর আড়াই হয়ে

গেল। সে আলাদা বিয়ে করে বম্বে আছে, নিজের মেয়েটির খোঁজও নেয় না, খরচও পাঠায় না। সিঁথিতে আমি আজও সিঁদুর পরি, কেন পরি, তা জানি না!

বলতে বলতে আর সামলাতে পারলো না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। অতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অতনু, সে বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই হাত দুটি বাড়িয়ে দিলো। ভীরু কপোতীর মতো ওর বুকে মাথাটা রাখলো মেয়েটি। কয়েকটি কঠিন নীরব মুহূর্ত পার হয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিলো মেয়েটিই প্রথম। সরে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো সন্তর্পণে, তারপরে আবার ওর কাছে এসে ওর চোখের ওপর চোখের দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলো,—আমি সলোমন সাহেবের মডেলের কাজ করতাম, তোমাকে তা' আগেই বলেছি। কিন্তু, আজ যা করতে এসেছি, তা' জীবনে এই প্রথম।

অতনু দুটি হাত রাখলো ওর দুটি কাঁধের ওপর, বললে,—আমরা যদি এ-কাজ করবো না বলি!

ম্লান একটু হাসলো মেয়েটি, বললে,—পাগল! টাকাটা হাত-ছাড়া হয়ে যাবে না! সাহেবের আর কী, আমরা রাজী না হলে অন্য পেয়ার আসবে।

অতনুর হাত দুটি শিথিল হয়ে গেল। তনিমার মুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছায়া পড়লো, বললে,—তখন কী কথাটা বললে? মেয়েদের সঙ্গে তেমন করে মেশো নি?

মাথাটা ঝাঁকিয়ে 'না' বলে ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে চলে গেল।

পিছন থেকে অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েটি বললে,—খুব শক্ত হবে তোমার পক্ষে কাজ করা!

ছেলেটি হতাশ হয়ে বসে পড়লো বিছানার ওপরে। মেয়েটি

ধীরে ধীরে ওর কাছে এসে বসলো, বললে,—সময় কিন্তু বেশী নেই। আমার কথা শুনবে ?

মুখ তুললো ছেলেটি, বললে—কী ?

—অভিনয় করতে পারো না ?—মেয়েটি বললে,—যেন একটা বদ্‌মাইস, লম্পটের ভূমিকায় অভিনয় করছো, এমন ভাবতে পারো না ?

—তাই ত ভাবছিলুম এতক্ষণ !—অতনু বললে,—নইলে—

থেমে গেল সে কথা শেষ না করে। মেয়েটি দাঁতের প্রান্ত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে কী যেন ভাবলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললে,—হয়েছে। এতক্ষণ আমার কথাটা মনেই পড়ে নি। কিন্তু যদি বাঁচতে চাও, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে, এই বলে দিলুম।

তর্জনী তুলে ওকে শাসাবার ভঙ্গীতে কথাটা বললো তনিমা, তারপরে উঠে গেল ঘরের কোণে। ঘসা কাঁচে ঢাকা দেওয়াল-আলমারীটা খুলে একটা বোতল নিয়ে এলো, নিয়ে এলো দুটি গ্লাস। ঠক্ করে বিছানার প্রান্তে রাখলো। ছেলেটি সভয়ে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়েটি বললে,—খেয়েছো কখনো ?

অতনু বললে,—মিথ্যে বলবো না। দলে পড়ে একবার খেয়েছিলুম।

—বমি হয়েছিল ?

—না। বমি হবে কেন !

মেয়েটি বললে,—অনেকের হয়। যাক, অন্যদিক দিয়ে নার্ভ তোমার স্ট্রং আছে। আমি খেয়েছি, সাহেবের মডেল হবার সময়।

বলতে বলতে বোতলের ছিপি খুললো মেয়েটি, দুটি গ্লাসে কিছুটা ঢাললো। উঠে গিয়ে বোতল রেখে এলো আবার যথাস্থানে। অন্য একটা গেলাসে জল নিয়ে এসে এ-দুটি গেলাসে

ঢাললো। বললে,—কী ভাবে খাবে জানো? মাতালদের মতো নয়। একেবারে এক চুমুকে, নাক টিপে। তাতে দেখবে, চোখ দিয়ে কান দিয়ে যেন আগুন বেরুতে থাকবে! আর তারপর? তারপর আর জানি না।

বলতে বলতে তেতো ওষুধ খাবার মতো এক হাতে নাক টিপে বিকৃত মুখে গলার মধ্যে গেলাস শুদ্ধ ঢেলে দিলো মেয়েটি। ঠক্ করে নামিয়ে রাখলো গেলাস। ছেলেটি অবাক হয়ে দেখ্ছিল ওর কার্যকলাপ। মেয়েটি গেলাস নামিয়ে রেখে ওর চোখের দিকে তাকালো। প্রশ্ন করলো,—কি হলো? অমন চুপ করে বসে রইলে কেন? তোমার গেলাসটা শেষ্ করো?

ছেলেটি আর দ্বিরুক্তি না করে মেয়েটির পথই অনুসরণ করলো। তনিমা তারপর বললে,—আমি জানি না, গেলাস দুটি উঠিয়ে রেখে এসো আলমারীতে, যদি পারো। আমি আর পারবো না। আমার মাথা ঝিম্ঝিম্ করছে। যেন জ্বর এসেছে একশো চার ডিগ্রী।

উঠলো অতনু। ধীরে ধীরে গিয়ে গেলাস রেখে এলো যথাস্থানে। হাঁটতে গিয়ে মনে হচ্ছে, নিজেকে খুব উঁচু দেখাচ্ছে। যেন অনেক উঁচু থেকে নীচের দিকে তাকাচ্ছে সে, এমনি ভঙ্গিমাতে এসে বিছানার প্রান্তে বসে পড়লো।

মেয়েটি ততক্ষণে ড্রেসিং গাউনটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলেছে। ও কাছে আসতেই সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো। পিঠের ওপর বক্ষ-বন্ধনীর সেই ফিতেটা।

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে চাবুকটা তুলে নিলো। খেয়াল মতো মেঝের ওপর দু-তিন বার চাবুক মারতেই মেয়েটি ওর দিকে ফিরলো, বললো,—ওখানে নয়, আমার ওপর চাবুক চালাও। যেন দেহের ওপর কেটে কেটে বসে যায়! বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান সব যেন ঐ চাবুকের ঘা খেয়ে একেবারে মরে যায়!

ছেলেটি চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো অন্যদিকে। বললে,—ওরা কি এখনো বেঁচে আছে? মনে করো এক অরণ্যে এসেছি আমরা। চারিদিকে বনানীর ছায়া-বিস্তার, তার মাঝখানে আমরা দুটি পশু—

বলতে না বলতেই 'আ' করে রগের দুটি পাশ চেপে ধরলো ছেলেটি, বললে,—ভীষণ যন্ত্রণা!

বিছানায় পর মুহূর্তেই লুটিয়ে দিলো সে নিজেকে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। একবার মনে হলো, ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? পরক্ষণেই হেসে ফেললো সে। এ-অনুভূতি তার নূতন নয়। সলোমনের ক্যামেরার সামনে যখন প্রথম দাঁড়াতে হয়েছিল নিরাবরণ হয়ে, তখন ঐ ওষুধ সে পান করে নিয়েছিল আকণ্ঠ। এসব মুখে তুলতে তার একটুও ভালো লাগে না, কিন্তু তবু তা' করতে হয়েছিল; সে দিন কেন, আরও দু-তিন দিন। সলোমন বলতো,—অভ্যেস করে ফেলো না, খারাপ হবে।

না, অভ্যেস সে করে নি। তারপরে ঐ ওষুধ ছাড়াই সে মডেল হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে শিখলো ধীরে ধীরে। সলোমনের ব্যবহার বরাবরই ভদ্র এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন। বৃদ্ধ, অশক্ত বলেই হয়ত তার লোলুপতা নেই,—ওর সামনে নিঃসংকোচে দাঁড়ানোর পিছনে সে-ও একটা কারণ।

কিন্তু মডেল হয়ে দাঁড়ানোও একটা অভ্যেস। এ-অভ্যেসের বশেই অতনুর সামনে নিঃসঙ্কোচ হওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না। কঠিন তার পরবর্তী পদক্ষেপ। ভালোবাসার পথ ধরে এ-পরিণতি এলে কোনো দ্বিধার কারণ থাকে না, কিন্তু—

—না, আর ভাববো না,—তনিমা নিজের মনেই বললে,—সন্ধ্যে হয়ে গেল, নিশ্চয়ই আসবে সলোমন। কিন্তু, লোকটার কী কাণ্ড! ও-ভাবে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে কেন?

তার মন অনুচ্চারিত শব্দে ওকে বলতে লাগলো,—ওঠো না? আর ভাবনা কী? ওষুধ আমাদের শিরায়-উপশিরায় তার কাজ করে চলেছে! তোমার টাকার দরকার নেই? তোমার মা-ভাই-বোন তোমার পথ চেয়ে আছে বলছিলে না? তোমার বাকী বাড়ী-ভাড়া, মুদি,—কতো কীই না তখন বলেছিলে? এখন চুপ করে আছো কেন?

আশ্চর্য! কথাগুলো সে ওকেই বলছে, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারছে না!

—কী হলো, এই?

এইবার স্বর ফুটলো কণ্ঠে, ছেলেটির কাঁধের কাছে হাত রেখে ও একটু নাড়া দেবার চেষ্টা করলো।

—আ!—বলে বিরক্ত হয়ে ওর হাতটা সরিয়ে দিলো অতনু। দিয়ে, বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে রইলো।

তনিমা পিছিয়ে এলো বিছানার প্রান্তে, তারপরে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে রইলো। অদূরে চাবুকটা পড়ে রয়েছে সাপের মতো এঁকে বেঁকে। কিছুক্ষণ অলস দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো তনিমা, তারপরে একসময়, বক্ষ-বন্ধনীটা হঠাৎ আঁট হয়েছে মনে হওয়ায় পিঠের কাছে ফিতের ফাঁস আল্‌গা করে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। একবার মনে হলো, টান দিয়ে ওটা একেবারে খুলে ফেলে, কিন্তু পরক্ষণেই হাত গুটিয়ে নিলো সে। কী দরকার? আসুক সলোমন, তারপরে দেখা যাবে। ঠিক কী ধরণের ছবি সে তুলতে চায় তাদের দুজনকে নিয়ে, কে জানে। আভাসে-ইঙ্গিতে জানিয়েছে তাকে সলোমন, হয়ত এই লোকটাকেও জানিয়েছে,—কিন্তু কথা থেকে জানা এক জিনিস, আর তাকে ঠিক কাজে পরিণত করা আরেক জিনিস।

—যা খুশী করুক,—মেয়েটি আবার নিজের মনে বলা শুরু

করলো,—কিন্তু কতো টাকা দেবে তুমি সলোমন? একশো টাকা মাত্র আগাম দিয়েছো, আর কতো দেবে? মুখে বলেছিলে,—অনেক টাকা। আমি 'অনেক' শুনেই রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক তার পরিমাণটা কতো? আরও দুশো? না, তিনশো? দেখ সলোমন, আর তিনশো দিও,—তুমি ছবি তোলার জন্য যা যা করতে বলবে, সব আমি করবো। আমি এখন পশু হয়ে গেছি!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাথার ভিতরকার শিরাগুলো দপ্ করে উঠলো। 'উঃ' বলে মাথা টিপে ধরলো সে। যেন বিদ্যুৎ-এর শক্ পেয়েছে। তারপরে, কী আশ্চর্য, তার মাথার ভিতরে যেন টাইপরাইটারের শব্দ হতে লাগলো,—খটাখট্—ঠকাঠক্—খটাখট্—ঠকাঠক্!

নিজের মনেই হেসে ফেললো সে। তার মস্তিষ্কের জগতে যেন একটা অফিস বসে গেছে। কতো কী ডিক্‌টেশন দিচ্ছে অফিসের কর্তা, আর, সেগুলি দেখতে দেখতে টাইপ হয়ে যাচ্ছে টাইপ-রাইটারে। 'এ-এস-ডি-এফ—এ-এস-ডি-এফ'। দিনকতক সে একটা স্কুলে টাইপ শিখতে গিয়েছিল, তাই না?

ধীরে ধীরে একসময় অফিস-এর কাজ বুঝি শেষ হলো। আর খটাখট্ শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তার প্রেশার-ট্রেশার আছে নাকি? অনেকের ব্লাডপ্রেশার থাকে। তার আছে কি না কে জানে।

—দূর, কী আবোল তাবোল ভাবছি আমি? মেয়েটি মনে মনে বললে,—তার থেকে লোকটাকে ডেকে তুলিনা কেন? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? ঘুমুলে চলবে? এলো বলে সলোমন। প্রস্তুত হও না?

—আঃ!

মেয়েটি আবার বুঝি চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেললো,—বুকটা টনটন করে উঠলো হঠাৎ। তার বেবীটা হবার পর বুকে

তার তৃষিত ঠোঁট দুটি সে ছোঁয়াতে দেয় নি। ফিডিং বটল, যাকে মেয়েরা চলতি কথায় 'বোতল' বলে, তাই দিয়ে শিশুটিকে সে দুগ্ধপান করিয়েছে। দুধের ভারে বুক টনটন করে উঠলে রবারের পাম্প দিয়ে বার করে দিয়েছে। তার স্বামী-নামক মানুষটিই তাকে এ-উপদেশ দিয়েছিল, বলেছিল,—খবরদার, ফিগার নষ্ট করো না।

বছর দুই পর্যন্ত বোতলে দুধ খেয়েছিল খুকী, তারপরে গেলাসে করে খেতে অভ্যেস করেছিল। সেই খুকী এখন বড়ো হয়েছে, ভালো বোর্ডিং-এই সে আছে, অনেক টাকা দিতে হয় মাসে মাসে। আর, সেই স্বামী নামধারী মানুষটা? না, তার কথা ভাবা চলে না। ভাবা উচিতও নয়! আজ ভাবতেও লজ্জা হয়, তাকে ভালবেসে সে বাপের বাড়ীর সবাইকে ছেড়ে সবার অমতে বিয়ে করেছিল। মা তখনই বলেছিল,—ভিন্ন জাতের লোককে বিয়ে করলি বলেই বলছি না, তুই ঠকবি, লোকটা ভালো না।

সেদিন মার ওপর আমি ভীষণ রেগে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলে বেরিয়ে এসেছিলাম! মেয়েটি নিজের মনেই বলতে লাগলো,—কিন্তু, বুঝিনি, মার কথা একদিন অমনভাবে সত্য হয়ে উঠবে! মোহ। আচ্ছা, মোহ আর প্রেমে তফাৎ কী?

তনিমা দেওয়াল থেকে মাথাটা তুলে সোজা হয়ে বসলো। বুকের ওপর বক্ষাবরণ যেন সেই প্রথম-মা-হওয়া-কালের 'পাম্পের মতো' চেপে বসে আছে। আস্তে আস্তে খুলে ফেললো। তাকালো বুকের দিকে। না, ফিগার তার আজও নষ্ট হয়নি। সলোমনের তোলা ছবিও সে দেখেছিল। ভালোই দেখায়। ঠিক একটি অ্যাংলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সলোমনের 'মলি', তার বাপ মায়ের রাখা নামের 'সুজাতা' নয়।

হঠাৎ-ই যেন চমকে উঠলো। অতনুকুমার তার দিকে মুখ ফেরালো নাকি? না, সে ত সেই থেকে একভাবে শুয়ে

আছে। তবে, ঘরে কেউ ঢুকলো নাকি? কার যেন পায়ের শব্দ শুনলো সে।

—মলি!

এবার স্পষ্ট দেখতে পেলো সে লোকটিকে। সলোমন সাহেব। সলোমন সাহেব তার সেই নতুন-আনা ক্যামেরাটার দিকে যেতে যেতে বললো,—রেডি ত?

—ইয়েস্।

সলোমন প্যাকেটশুদ্ধ ভারী ক্যামেরাটা এনে টেবিলে রাখলো। তারপরে বাইরে গিয়ে আলোর স্ট্যাণ্ড নিয়ে এলো। রাখলো, বাল্‌ব পরালো, কতো কী কর্‌লো। এসব সে জানে। এসবে সে অভ্যস্ত। এখুনি সুইচ্ টিপে সে চোখ ধাঁধানো আলো ফেলবে তাদের ওপর।

সলোমন তারপরে তার ক্যামেরা বার করলো। টেবিলটা টেনে আনলো বিছানার কাছে, তার ওপর রাখলো ক্যামেরাটা। এটা নতুন ক্যামেরা, এটা সে আগে দেখে নি।

—হলো কি তোমার পার্টনারের? ঘুমুচ্ছে নাকি? তোলো তোলো?

মলি বা তনিমা এগিয়ে গিয়ে ঠেলতে লাগলো অতনুকে,—এই, ওঠো ওঠো?

কাকে জাগাবে? লোকটা সত্যিই নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। অনেক চেষ্টাতেও তাকে সে জাগাতে পারলো না। ওষুধের গুণ নাকি?

ফিক্ করে হেসে ফেললো মলি বা তনিমা। হয়েছে আজ কাণ্ড! সলোমন ওদিকে আলো-টালো জ্বালিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিয়েছে। অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললে,—ওঠাও ওকে যেমন করে পারো। সময় নষ্ট করতে পারবো না। পুলিশের ভয় আছে না?

—পুলিশ!

কুঁজোসাহেব বললে,—আমি হুঁশিয়ার আছি। স্টুডিও বন্ধ করে এসেছি। তবুও বলা যায় না, কাজটা বেআইনী তো ?

—তবে, করছো কেন বেআইনী কাজ ?

—টাকার জন্য।—সলোমন বললে,—এ-ক্যামেরাও আমার নয়, কাজটাও আমার নয়। ক্যামেরা অবশ্য ভাড়া করেছি, কিন্তু এই ছবি তুলছি বিরাট এক বড়লোকের অর্ডারে। তিনি আবার ব্যবসা করবেন এ-দিয়ে। আমি শুধু কনট্রাক্ট নিয়েছি কাজটা করে দেবো বলে। তোমাদের মতো আমিও পারিশ্রমিক পাবো।

মলি বললে,—কী করতে হবে আমাকে বলো। আমিও আর দেরী করতে চাই না।

কুঁজোসাহেব বললে,—তুমি একা একা কী ছবি তুলবে ? তুলতে হবে দুজনকে নিয়ে। মাই গার্ল, এটা সাধারণ ক্যামেরা নয়, এটা মুভি ক্যামেরা। একটি পুরো রীল তুলবো তোমাদের নিয়ে। সিক্সটিন মিলিমিটার ফিল্ম।

মলি বললে,—ছবি বিক্রী করবে না তুমি—বিদেশী সেলারদের কাছে ?

—না না, সে কাজ নয়।—সলোমন বললে,—তার মডেল ত তুমি আছোই। তারা শুধু বিভিন্ন পোজের তোমার একার ছবি পেলেই খুশী। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে দেশ-বিদেশে চালান করে। আমি নেগেটিভও তাদের দিয়ে দেই। কী জানি, পুলিশ যদি এসে সার্চ-টার্চ করে! হুঁশিয়ার থাকা ভালো।

মলি ওর দিকে তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করে সাহেব বললে,—আমি তোমাদের ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই নেগেটিভ চালান করে দেবো সেই বিশিষ্ট বড়লোকটির কাছে। ব্যস্, আমার দায়িত্ব শেষ। তিনি কোথা থেকে কাকে দিয়ে প্রিন্ট করাবেন, তিনিই জানেন। তারপরে, সিনেমা দেখার মতো

তোমাদের ছবি পর্দায় প্রতিফলিত দেখবে লোক, গোপনে। একে চলতি কথায় বলে,—'ব্লু-ফিল্ম'। কিন্তু, কী হবে এখন, যদি ঘুম না ভাঙে লোকটির? আমি আর রিস্ক নিতে পারবো না। তোলা না হলে ক্যামেরা ফিল্ম সব যথাস্থানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবো।

—তোমার টাকা? যা আমাদের আগাম দিয়েছো?

সলোমন বললে,—আমাকে ফেরৎ দিয়ে দেবে।

মলি ওর দিকে এগিয়ে এলো কয়েক পা, বললে,—আচ্ছা, এ-ছবি তোলা হলে, আমরা কত টাকা পাবো?

—অনেক টাকা।

মলি বললো,—সে তো আগেই বলেছো। অনেক টাকা মানে কি? দুশো তিনশো?

বুড়ো হাসলো,—না; ও পাবে পাঁচশো টাকা, তুমি পাবে হাজার। আর, আমি কতো পাবো, সেটা তোমাদের বলবো না।

—হা—জা—র-টা—কা?—মেয়েটি চোখ কপালে তুললো।

—হ্যাঁ।

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো, তারপরে চট্ করে বিছানার ওপর বসে পড়ে অতনুকে প্রাণপণে ঠেলতে লাগলো,—এই, ওঠো ওঠো শীগ্‌গির।

প্রাণপণ ঠেলায় ছেলেটা একটু চোখ খুললো মনে হলো, বললে,—উঁ?

—উঠে বসো। সাহেব এসেছে।

বসবার চেষ্টা করলো ছেলেটা, পুরো চোখ খোলবারও চেষ্টা করলো। মেয়েটি তখনো ওকে ধরে আছে, বললে,—অনেক টাকা পাবে জানো? যা করতে বলে, মেনে নাও চোখ-কান বুজে। এই, কী হলো?

ছেলেটি চেষ্টা করেও বসে থাকতে পারলো না, আবার সটান শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে।

মেয়েটি হতাশ হয়ে বসে পড়লো,—কী হবে ?

সলোমন বললে,—টাকা পাবে না।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো, ওর কাছে এলো, বললে,—আজই পুরো টাকাটা দেবে ত ?

কুঁজো বললে,—কখনো তোমার টাকা বাকী রেখেছি ?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে এবার বললে,—কিন্তু, ও যে উঠছে না !

—ওঠাও।

মলি বললে,—তুমি নিজে ওঠাতে পারো না ?

সলোমন শান্ত গলায় বললে,—আমি হার্টের রোগী, তা জানো ? আমার পোষাবে না। ওঠে ত হবে, নইলে কাজ বন্ধ। হাজার টাকা তুমি হারালে। এই বলে দিলাম।

মলির উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সে মরীয়া হয়ে এগিয়ে গিয়ে চাবুকটা তুলে নিলো। বললে,—নেশা হয়েছে কি না ! দাঁড়াও নেশা ছাড়াচ্ছি।

বলতে বলতে ছেলেটার পিঠের ওপর সপাং সপাং দুবার চাবুক চালালো। ছেলেটার দেহটা কুঁকড়ে উঠলো, সে পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না, আবার পড়ে গেল। মলির তখন খুন চেপে গেছে, সে বলতে লাগলো,—কাপুরুষ ! এতগুলো টাকা ! ওঠো, ওঠো বলছি ! আজ তোমারই একদিন—কি, আমারই একদিন !

বলতে বলতে লোকটার গায়ে এবার সে সজোরে চাবুক চালাতে লাগলো এলোপাথারি। তার নিষ্ঠুরতায় সলোমন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। সে ওর হাত থেকে কাড়তে গেল চাবুকটা।

কিন্তু, কে শুনবে ? যেন বাঘিনীর বল এসেছে মেয়েটার শরীরে।

সলোমন বললে,—এ-চাবুক সাংঘাতিক চাবুক। অমন করে মারতে নেই। মরে যাবে যে লোকটা!

লোকটা যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করতে লাগলো বিছানায়, মূক পশুর মতো ছটফটানি। একটা ছাগলকে বলি দিলে তার মুণ্ডহীন ধড়টা যেমন করে ধড়ফড় করে ঠিক তেমনি!

সারা পিঠময় দড়ির মতো ফুলে উঠতে লাগল মাংস। অবশেষে ছেলেটা এক সময় স্থির হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে গোঁ-গোঁ করতে লাগলো। ততক্ষণে চাবুকটা বাঘিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কুঁজোসাহেবটা রীতিমত হাঁপাতে-হাঁপাতে চেয়ারে বসে পড়েছে। হাপরের মতো ওঠানামা করছে তার বুক!

মেয়েটি বুঝি পাগল হয়ে গেছে! সে চাপা চীৎকারে নিজের খোঁপার চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে লাগলো, বলতে লাগলো, —কাপুরুষ—কাপুরুষ! কাপুরুষ কোথাকার!

একটু দম নিয়ে কুঁজোসাহেব উঠলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ছেলেটির কাছে, ওকে পরীক্ষা করে বললো,—ঈস্! কি করেছো তুমি? অজ্ঞান হয়ে গেছে! শীগ্গির জল নিয়ে এসো।

বাঘিনী তখনো গর্জন করছে,—কিন্তু আমার কাজ? আমার টাকা?

কুঁজোসাহেব বললে,—ওর সারা গায়ে মলম লাগিয়ে ওকে সারারাত শুশ্রূষা করে, সুস্থ করে তুলতে হবে। ওর পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। ঘণ্টা দুয়েক পরে সেই বিশিষ্ট বড়লোক মানুষটির লোক আসবার কথা আছে টাকা নিয়ে। টাকা দিয়ে সে ক্যামেরা নিয়ে চলে যাবে কথা আছে! ক্যামেরা নিয়ে ঠিক সে চলে যাবেই, কিন্তু টাকা সে দেবে না। আর কেনই বা দেবে?

মেয়েটির চোখ দুটো তখনো জ্বলছে, বললে,—ওটাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে আনতে পারো না? এখুনি?

কুঁজো বললে,—না। অত সোজা নয়। পুলিশ ধরতে পারলে

এ-সব ব্যাপারে কখনো ক্ষমা করবে না। অনেক আঁটঘাট বেঁধে এ-সব কাজে হাত দিতে হয়।

—যে লোকটা আসবে, তাকেই বরং নিয়ে এসো।

সাহেব বললে,—সে লোক নিজেই জানে না কী এ ব্যাপার, কীসের এ-ফিল্ম। তা ছাড়া, সব কাজে সবাই রাজী হবে কেন ?

মেয়েটি তার মুখের মধ্যে হাতের আঙুলের প্রান্ত ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কামড় বসালো সজোরে। এতো জোরে, যে, আঙুল কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। ওর মুখের কস্ বেয়ে রক্তের ধারা বেরোতে দেখে সলোমন চীৎকার করে উঠলো,—মলি !

হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়লো মেয়েটি, ধীরে ধীরে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো সে। তার বহু-যত্নে বাঁধা হালফ্যাশানের খোঁপাটা ভেঙে চুলগুলি পিঠময় ছড়িয়ে গেল।

কুঁজোসাহেবের ভূমিকাই এবার হলো লক্ষ্যণীয়। সে মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে ঘষাকাঁচের আলমারীটা খুলে কয়েকটা মলমজাতীয় ওষুধ, তুলো, আইওডিনের শিশি—এ-সব নিয়ে এলো।

মেয়েটির দিকে গেল না সে। বিড়বিড় করতে করতে শুধু বললে, —কাঁদুক হতভাগী। আমি ছেলেটাকে দেখি।

সে ছেলেটির পাশে বসে নিপুণ হাতে ওর পিঠময় মলম লাগাতে লাগলো। ছেলেটা 'উ-উ' করে উঠতেই স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললে,— আর একটু সহ্য করো মাই বয়।

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই। সলোমনের কাছে এ-সব ওষুধ মজুত থাকে কিছু কিছু,—এবং সেদিনও ছিল বলে রক্ষে, নইলে ডাক্তার-টাক্তার ডাকতে গেলে লোক জানাজানি হয়ে যেতো। তারপরে, থানা-পুলিশ এবং আরও কতো কী ?

সলোমন লোশন আর তুলো দিয়ে ছেলেটার পিঠের ফুলো

ফুলো অংশে ভালো করে বুলিয়ে দিয়ে মলম লাগিয়ে দিতেই ছেলেটা স্বস্তি অনুভব করলো। সে উঠতেও গেলো। বাধা দিলো সলোমন,—উঠো না, খবরদার্। শুয়ে থাকো।

তারপরে, ওসব রেখে দিয়ে শুধু আইওডিনের শিশি আর তুলো নিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। নিস্তেজের মতো সে শুয়ে আছে এবার, তার আঙুলের রক্ত বেরিয়ে এসে মেঝের কিছুটা অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সলোমন আঙুল দুটো ধরতে যেতেই মেয়েটা ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলো, উঠে বসলো সে।

—মলি!—ধমকে উঠলো সলোমন,—কতোটা ড্রিংক করেছো যে, এমন মাতাল হয়েছো? নিশ্চয়ই এক চুমুকে খেয়েছো? ওটা যে কত খারাপ, তা তোমায় আমি বলি নি?

বলতে বলতে ওর হাতটা টেনে নিলো সলোমন! এবার কী ভেবে আর বাধা দিলো না মলি। দু-দুটো আঙুল জখম হয়েছে। অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলো সলোমন,—সর্বনাশ! তুমি রাক্ষুসী না কী? এ-রকম করে নিজের আঙুলে নিজে দাঁত বসিয়ে দিতে পারে মানুষ? হাড় বেরিয়ে পড়েছে!

রক্ত তখনো বন্ধ হয় নি। আবার উঠে গিয়ে প্লাস্টার-ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলো সলোমন। তুলো-আইওডিন লাগিয়ে বেশ করে ব্যাণ্ডেজ করে দেবার পর রক্ত বন্ধ হলো। আইওডিন দেবার সময় খুব জ্বালা করে ওঠবার কথা, কিন্তু মেয়েটির মুখে একটুও যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠলো না!

॥ ৭ ॥

সব কাজ শেষ করে সলোমন যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন তার কোমরটা ব্যথায় টন্ টন্ করছে, হাঁপিয়ে পড়েছে বুড়োমানুষ! আলমারীতে ওষুধ টষুধগুলো তুলে রাখতে রাখতে রম-এর বোতলটা লক্ষ্য করলো সলোমন,—কী সর্বনাশ! আধ বোতল খালি একেবারে। এতোটা ওরা খেয়েছে দুজনে, এবং তা-ও নিশ্চয়ই এক চুমুকে। মাতালদের কাণ্ড। সাধে কী আর এইসব টুকিটাকি ওষুধ মজুদ করে রেখেছিল সলোমন?

সলোমন ওদের কাছে এসে সেই চেয়ারটার ওপর বসে পড়লো। ডাকলো,—মলি?

—উঁ?

—কেমন বোধ করছো এখন?

মেয়েটি দুই হাঁটু দুই বাহুতে বেষ্টন করে বসেছিল, মুখ তুলে তাকালো সলোমনের দিকে, বললো—ওটা কেমন আছে?

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সলোমন বললে,—ভালো।

মলি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—তাহলে আর দেরী কেন?

বলতে বলতে সে তার ঘাঘ্‌রার মতো সায়াটার ফাঁশ আল্‌গা করে দিতে লাগলো।

—না না, ও কী করছো?—সলোমন বললে,—দরকার নেই। আমি মানুষ নই, একথা ভেবো না। আজকে ছেলেটা কিছুতেই পারবে না, আমি বরং দেখি চেষ্টা করে আরেকটা 'ডেট্' নিতে পারি কিনা!

মেয়েটির চোখ দুটি আবার ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো,—সেদিনও কি ছেলেটা ভয়ে পিছিয়ে যাবে না ?

—এ কথা আসছে কেন ?—সলোমন বললে,—ওর কী দোষ ? দোষ ত তোমারই ? কেন ওকে এমন করে একচুমুকে অতটা রম খাওয়াতে গেলে ?

মলি মাথা ঝাঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো,—আঃ ! যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ডেট যদি নাও ত, অন্য লোক ঠিক করবে, একে দিয়ে চলবে না, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিলুম।

—দেখি, কী করা যায়,—সলোমন বললে,—ডেট পাওয়াও কি সোজা নাকি ? হয়ত পার্টি হাতছাড়া হয়ে যাবে। শহরে সলোমন কী আর নেই বলতে চাও ?

মেয়েটি নির্বাক ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। সলোমন মুখ নীচু করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মলি মুখ ফেরালো ছেলেটির দিকে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে সে। আস্তে আস্তে সেই দেওয়ালের কাছে সরে গিয়ে ওর দৃষ্টির সম্মুখ থেকেই বক্ষবন্ধনীটা তুলে নিয়ে এলো। যথাস্থানে সংলগ্ন করলো। আর, তার ঠিক পরক্ষণেই ছেলেটি অতি কষ্টে মুখ ফেরালো ওর দিকে। পিঠটা নাড়া পেয়ে তখনো যন্ত্রণায় রীন্ রীন্ করে উঠছে।

মেয়েটি চেয়ারে বসে পড়লো। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। ছেলেটি চোখ নামিয়ে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপরে একসময় সে ধীরে ধীরে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু সে দাঁড়ালো।

মেয়েটি একদৃষ্টে তখনো তাকে দেখছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের ভিন্ন দিকে, যেখানে আয়নাটা রয়েছে,

সেখানে যেতে লাগলো। লুঙ্গিটা ছেড়ে সে বোধহয় নিজের পোশাক পরবে, এই ইচ্ছা।

মেয়েটি তীব্র অথচ চাপা কণ্ঠে বললে,—পালানো হচ্ছে।

ছেলেটি মুখ ফেরালো না, মুখখানা তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। সে তার প্যাণ্টটা হাতে তুলে নিলো।

মেয়েটি কোনো উত্তর না পেয়ে আবার তেমনি কণ্ঠেই বলে উঠলো,—খুব বীরপুরুষ! যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি? সারারাত বরং শুয়ে থাকো এখানে।

ছেলেটি এবারে চট্ করে মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে, বললে,—ঘেন্না করে।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির মুখে, বললে,—কোথায় ছিল এ ঘেন্না, যখন সলোমনের কথায় রাজী হয়ে এখানে এসেছিলে? টাকাটা আজ আমি পাবো না, কী ক্ষতি হলো আমার জানো?

ছেলেটি বললে,—থাক, ও কথা শুনতে চাই না।

বলতে বলতে প্যাণ্টটা সে পরে ফেললো কোনক্রমে।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললে,—বাড়ী যেও না, কী কৈফিয়ৎ দেবে, মার কাছে? গুণ্ডায় ধরে মেরেছে? মুখে তাহলে ও কিসের গন্ধ?

ছেলেটি নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল করে।

বিধবা মা, তার বাড়ী ফিরতে দেরী হলে যে রীতিমত ছট্‌ফট্ করে, সে তাকে এই অবস্থায় দেখে যদিই বা সহ্য করতে পারে, মুখের গন্ধ সে সহ্য করবে কেমন করে?

বলে উঠলো,—নেশা আর নেই।

—গন্ধ তবু আছে। তুমি টের পাচ্ছো না, আমি পাচ্ছি।

ছেলেটি চুপ করে রইলো।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো,—কাছে আসবো?

—কেন?

মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে এলো, ওর পাশ কাটিয়ে আলমারীর কাছে গিয়ে বার করে আনলো মলমের কৌটো, বললে,—আর একটু লাগিয়ে দি। বুড়ো চোখে ভালো দেখতে পায় না, ঠিকমতো লাগাতে পেরেছে কিনা কে জানে!

—না।

চট্‌ করে ওর হাতটা ধরলো মেয়েটি, টান দিলো, বললে,—না নয়, কথা শোনো।

ছেলেটি বললে,—তোমার ত হাতে ব্যাণ্ডেজ, দেবে কী করে?

মেয়েটি বললে,—ও, লক্ষ্য পড়েছে তাহলে! ভেবো না, আমি ঠিক পারবো। এসো, বিছানায় এসে শুয়ে পড়ো ত আস্তে আস্তে?

ছেলেটি বললে,—একেই বলে, গরু মেরে জুতো দান!

চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে এলো মেয়েটির। সে মুখটা ফিরিয়ে যথাসম্ভব গোপন করতে লাগলো তার এই দুর্বলতার চিহ্ন। তারপরে ছেলেটি শুয়ে পড়তেই তার পিঠের ক্ষতস্থানে অতি যত্নে বুলিয়ে দিতে লাগলো মলম। ছেলেটি চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল নিশ্চল হয়ে।

মেয়েটি তার কাজ শেষ করে মুখ তুললো, বললে,—এ-চেহারা নিয়ে বাড়ী যেও না। এখানেই থাকো, কাল সকালে চলে যেও। যা বলছি, শোনো।

ছেলেটি চোখ খুললো, বললে,—কাল সকালে বুঝি চিহ্ন থাকবে না?

—চিহ্ন থাকবে, ব্যথা থাকবে না।

ছেলেটি মুখ ফেরালো ওর দিকে, বললে,—আমার মা চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না বুঝি ?

ম্লান একটু হাসলো মেয়েটি, বললে,—তখন অনেক গল্প তুমি বানিয়ে বলতে পারবে।

—আজই বা বলতে পারবো না কেন ?

মেয়েটি বললে,—পারবে, কিন্তু সঙ্গে ব্যথাটা থাকলে মায়ের ব্যাকুলতা আরও বাড়বে। কী জানো তোমরা মায়ের মন ?

ছেলেটি জোর করে মেয়েটির দিকে পাশ ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে 'উঃ' করে উঠলো। মেয়েটি ওর পিঠে হাত দিয়ে ওকে আগের ভঙ্গিতেই শুইয়ে দিলো।

তারপরে, ধীরে ধীরে ওর সারা পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ এক সময় ওর মাথার পিছনের চুল একটু মুঠি করে ধরে নাড়া দিলো, কোমল কণ্ঠে বললে,—খুব তখন লেগেছিল, না ?

ছেলেটি আবার মুখ ফেরালো ওর দিকে, বললে,—দেখ, একটা কথা বলবো ?

—কী ?

—বুড়ো এখনো কিন্তু নিয়ে যায় নি ক্যামেরাটা।

—হ্যাঁ, তা' নিয়ে যায়নি বটে।

ছেলেটি আস্তে আস্তে উঠে বসলো, বললে,—ওকে বলো গিয়ে, আমি রাজী। যা বলবে সব করবো। জানো, টাকার আমার খুব দরকার। আমি গেলে মা কি আমার ব্যথার কথা জানতে চাইবে ? না, যাওয়ামাত্রই দরজা খুলে হাত পেতে বলবে,—খোকা, টাকা এনেছিস ?

ছেলেটি কথা বলে যাচ্ছে, মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত কোমল দৃষ্টিতে। ও কথা শেষ করতেই মেয়েটি বললে,—তুমি রাজী, না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে ছেলেটি বললে,—বললাম ত, হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে,—তাহলে, ডাকি কুঁজো-বুড়োকে?

কিন্তু ডাকতে হলো না, বুড়ো নিজেই ঘরে এলো এই সময়। এসে, ওদের অমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে গেল।

তনিমা অতনুর পিঠে হাত রাখা অবস্থাতেই বলে উঠলো,—সাহেব, ও ভালো হয়ে গেছে। তুমি তোমার কাজ আরম্ভ করতে পারো।

বুড়ো বসে পড়লো চেয়ারটায়। ওদের দিকে মিট্‌মিট্ করে তাকাতে তাকাতে বললে,—ক্যামেরা যাঁর, তাঁর লোক ঘড়ি ধরে ঠিক সময়েই এসেছিল। তারই সঙ্গে কথা বলছিলাম এতক্ষণ। ক্যামেরাটা আমার কাছেই এখন থাকবে। ঠিক তিনদিন পরে, অর্থাৎ, আজ থেকে চতুর্থ দিন, তোমাদের ডেট্ নিলুম। রাজী? বিকেল চারটেয় আসবে কাঁটায় কাঁটায়।

অতনু উঠে বসেছে ততক্ষণে, বললে,—কিন্তু, আজ হবে না কেন?

বুড়ো বললে,—মাই বয়, আজ তুমি পারবে না।

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—তুমি কেন, মলিও পারবে না, ওরও নেশা ছুটে গেছে।

আর দাঁড়ালো না বুড়ো, পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে গেল।

পাশের ঘরে খট্ করে আলো জ্বললো! বুড়োর নিজস্ব শোবার ঘর। বুড়ো এবার বোধহয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। অতনু তনিমার কাঁধে একটা হাত রাখলো, বললে,—সত্যি?

—কী?

—নেশা ছুটে গেছে?

চোখ দুটি আবার ছলছল করে এলো তনিমার, ধরা গলায় বললে,—কিন্তু বুড়ো সেটা বুঝলো কী করে ?

ছেলেটি বললে,—কী হবে তাহলে ?

মেয়েটি বললে,—চতুর্থ দিন। আসছো নিশ্চয়ই ?

—আসবো বই কি !

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো, নিশ্চুপে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো, মুখের রঙ তুলে ফেলে সাধারণভাবে হাল্‌কা পাউডার বুলিয়ে নিলো। চুলের ধরণটা বদলে সাধারণ খোঁপায় পরিণত করলো। তারপরে উঠে, ওর দিকে পিছন ফিরে জামাটা পরলো, সায়ার ওপর শাড়ীটা ঠিকমতো জড়িয়ে নিলো। হাতে নিলো সেই ব্যাগটা। তারপরে ওর দিকে ফিরে যখন দাঁড়ালো, তখন সে একেবারে অন্য মানুষ। অল্প একটু হেসে বললে,—কটা বাজলো ?

ছেলেটি তেমনি বসেই আছে বিছানার প্রান্তে, বললে,—হাতে কি আমার ঘড়ি আছে নাকি ?

—তবু, আন্দাজ ?

—আটটার বেশী নয়।

তনিমা বললে,—তাহলে বাস পাবো।

—যাবে কোথায় ?

—কোথায় আবার ! বাড়ী ?

—সে-ই ত জিজ্ঞাসা করছি। বাড়ীটা কোথায় ?

তনিমা মুখ টিপে একটু হাসলো, বললে,—একদিনে অতোটা জানা ভালো নয়। চলি, কেমন ?

অতনু উঠে দাঁড়ালো, বললে,—কী বিপদ ! আমি কী করবো ?

—থাকতে বললাম না তোমাকে ?

—একা একা ?

হেসে ফেললো মেয়েটি, বললে,—তবে কি আমাকেও থাকতে হবে নাকি ?

ধীরে ধীরে কাছে এলো ওর, ওর চওড়া বুকে আঙুল দিয়ে একটু টোকা দিয়ে বললে,—তা হয় না। যেখানেই থাকি, নটার মধ্যে বাড়ী আমাকে ফিরতেই হয়।

—তাহলে, আমিও যাবো। একটু দাঁড়াও।

মেয়েটি ওর চোখের দিকে তাকালো, বললে,—আমার কথা তাহলে শুনবে না ?

ওর হাতটা ধরে ছেলেটি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো,—না, একা আমি থাকতে পারবো না, আমি যাবো।

—বেশ, যা খুশী করো।

বলে, হাত ছাড়িয়ে তনিমা চলে যাচ্ছে দেখে অতনু বলে উঠলো,—দাঁড়াও, জামাটা পরি।

মেয়েটি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো, বললে,—একসঙ্গে বেরুনো হবে না। আমি এগিয়ে গেলাম। তুমি এসো।

—কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মেয়েটি হাসলো, বললে,—না দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কী ? দেখা ত হচ্ছে আবার, চতুর্থ দিনে।

ছেলেটি বলে উঠলো,—তা হোক। তুমি কোথায় দাঁড়াবে বলো ? আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ছেলেটির কণ্ঠে ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে একটু বুঝি বা অবাক্ হয়ে গেল তনিমা, ঘুরে, ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ছেলেটি অমনি তৎপর হয়ে তার গেঞ্জিটা গায়ে দিতে গেল। কিন্তু পিঠে ব্যথার দরুণ সে শরীরটাকে ঠিক বাঁকাতে পারলো না, যন্ত্রণায় মুখখানা আবার বিকৃত হয়ে উঠলো তার।

চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সমস্তই লক্ষ্য করছিল মেয়েটি। সে

আর পারলোনা, টেবিলের ওপর হাতের ঝুড়িটি রেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো ওর কাছে। গেঞ্জিটা নিয়ে ওকে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিতে সাহায্য করতে লাগলো।

অনেক কাণ্ডের পর গেঞ্জিটি পরে নিলো অতনু, তারপরে, জামাটা পরতে আর অসুবিধা কী? এক মিনিটেই হয়ে গেল।

মেয়েটি ওর এই উৎসাহ লক্ষ্য করছিল দুটি চোখ ভরে। ও যখন জুতো-টুতো পরে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে,—'আমি রেডী চলো',—তখন আর নড়তে পারলো না মেয়েটি, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—তুমি কী? একটুও রাগ হচ্ছে না আমার ওপর? তখন ত ঘেন্না হচ্ছিল বলছিলে, এখন আর হচ্ছে না!

—কেন, তুমি রেগে গিয়ে চাবুক চালিয়েছ বলে?

মেয়েটি বললে,—না। চাবুক যে আমি চালাই নি, চালিয়েছে আমার মধ্যে বসে দারিদ্র্য নামে এক প্রচণ্ড অবুঝ রাক্ষস, সে-টুকু বুঝতে তোমার ভুল হয় নি আমি জানি। কিন্তু, একথা কি তোমার মনে হচ্ছে না, আমি কতো হীন একটি মানুষ, কী হীন কাজ করতেই না এসেছিলাম পেটের দায়ে?

—সে তো আমিও এসেছিলাম।

তনিমা বললে,—পুরুষ আর মেয়েতে এ-সব ক্ষেত্রে অনেক তফাৎ। এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছো, আমি ঠিক বাজারে মেয়েমানুষ নই। আমার পক্ষে—

বাধা দিয়ে অতনু বললে,—থামো। ওসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। আর তা ছাড়া, এত কথা বলবারই বা কী আছে? চলো যাই।

মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

বললে,—একটা নেশা আমার ছুটে গেছে, আরেকটা নেশায় পেয়ে বসেছে যে আমাকে।

—কী?

তনিমা বললে,—আমাকে নিয়ে যাবে এখন, তোমাদের বাড়ী?

ছেলেটি বোধহয় এ ধরণের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই একটু সময় নিলো কথার উত্তর দিতে। বললে,—হ্যাঁ যাবো যাবো না কেন?

—কী পরিচয় দেবে?

—কী আবার? বান্ধবী।

মেয়েটি ওর হাত ধরে বল্‌লে,—এ-রকম বান্ধবী কখনো নিয়ে গেছো বাড়ীতে?

—না, তা, নিয়ে যাই নি অবশ্য।

—তা হলে?

—কী তা হলে?

তনিমা বললে,—মা কী ভাববেন?

অতনু বলে উঠলো,—দেখ, অতো ভাবলে টাবলে চলে না। নিয়ে ত যাই, তারপরে যা হয় ভাববেন।

তনিমা বললে,—খুব ত বীরপুরুষ! পিঠের দাগ? পিঠে ব্যথা আর দাগ নিয়ে রাত্রিবেলা বাড়ী ঢুকছো, সঙ্গে একটি যুবতী মেয়ে। সব মিলিয়ে কী দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছো?

অতনু বলে উঠলো,—সুন্দর দাঁড়াবে। গুণ্ডারা মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম, প্রচণ্ড মারামারি হলো, আমি শেষ পর্যন্ত এঁকে উদ্ধার করে এনেছি।

তনিমা হেসে ফেললো, বললে,—গল্পটা সুন্দর। কিন্তু উদ্ধার করবার পর থানায় না গিয়ে বাড়ীতে কেন?

—না না, আমার মা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

তনিমা বললে,—মা মাথা না ঘামালেও প্রতিবেশীরা ঘামাবে। বাড়ীর অন্য ভাড়াটেরা ঘামাবে। নিশ্চয়ই ভাড়া বাড়ীতে থাকো?

অতনুর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো, সে চিন্তিত মুখে বললে,—তাই ত।

তারপরে ওর ধরা হাতখানায় একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে,—তার থেকে তোমার বাড়ীতে আমি যাই না?

মেয়েটি হেসে উঠলো, বললে,—চমৎকার! তার থেকে এখানে রাত কাটাতেই বা আপত্তি কি?

—দি আইডিয়া!—অতনু ওকে একেবারে দুটি হাতে বেষ্টন করে ধরলো, বললো,—সারারাত না ঘুমিয়ে দুজনে গল্প করবো, কেমন?

এবারে কালো হয়ে উঠলো মেয়েটির মুখ। বললে,—তা হয় না। নটার মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে। বললাম না?

মেয়েটি তারপর করলো কী, চট্ করে ওর ঘাড়ের কাছে দুটি হাত রেখে মুহূর্তের জন্য ওর মুখের ওপর ঠোঁট দুটি আলগোছে ছুঁইয়ে দিয়েই নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। তারপরে তাড়াতাড়ি হাতের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলো।

ছেলেটি বলে উঠলো,—একসঙ্গে যাবো না?

তনিমা বললে,—না, বুড়োর আপত্তি আছে। পুলিশের নজরও পিছু নিতে পারে। আমি আগে যাই, তুমি পরে এসো।

ছেলেটি বললে,—ধর্মতলার মোড়ে তাহলে দাঁড়িয়ে থেকো।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো শুধু, আর কিছু বললো না, তারপর পর্দা ঠেলে দ্রুতপায়ে চলে গেল বাইরে।

ভিতর থেকে ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো অতনু। বুড়োর সঙ্গে দুটি-একটি কথা কী যেন বলাবলি করলো সে।

কয়েক মুহূর্ত পরে অতনুও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। পাশেই সলোমনের ঘর। অতনু বেরিয়ে যাবে আন্দাজ করেই কুঁজো-সাহেবটা তার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ও কাছে আসতেই বললে,—বাইরে বেরুনোর দরজা জানো ত মাই বয়? স্টুডিও নয়, স্টুডিও বন্ধ। এসো আমার সঙ্গে।

বলে, সরু করিডোরটা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই বাথরুমটার পাশের একটি দরজার ছিট্‌কিনি খুলে ফেললো সলোমন। বিরাট লম্বা একটা করিডোর, দুপাশে সব সারিসারি ঘর। কোথাও ইংরেজী রেকর্ড বাজছে, কোথাও রেডিও, কোথাও বাচ্চা কাঁদছে, তার শব্দ। এই সব পেরিয়ে একটা গলিমতন জায়গায় পড়লো। বাড়ীর ভিতরকার গলি, খুব কম আলো এখানে।

সেটা পর্যন্ত সলোমন তাকে এগিয়ে দিলো, বললে,—বাঁদিকে যাও, তাহলেই পথ পাবে। গুড্‌ নাইট। চতুর্থ দিনের কথাটা মনে রেখো।

—নিশ্চয়ই! গুড্‌ নাইট।

বলে, বাঁদিক ধরে বেরিয়ে এলো অতনু। এটা বাড়ীর ভিতরকার একটা গলি। সিমেণ্ট করা ছিল এককালে, এখন ভেঙেচুরে গেছে, খোয়া বেরিয়ে এসেছে। করিডোরটার চেয়ে চওড়া। এরও দুপাশে ঘর। ঘরের সামনে কোথাও কোথাও মোড়া টেনে বসে আছেন গৃহকর্তারা। এক কথায়, চতুর্দিকেই শান্ত গৃহস্থালীর চিত্র। গলির মধ্যে দুটি-একটি অ্যাংলো ছেলের জটলা। টুইস্ট-নাচ, ইত্যাদি।

সে-সব পেরিয়েই একটা লৌহ ফটক। সেটা খোলা ছিল। বেরিয়েই পেলো একটা দশফুট চওড়া কমন প্যাসেজ-এর মত ছোট গলি, ডানদিকে বেঁকে গেছে। সে-দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে কর্মব্যস্ত জনযানবহুল ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

ত্বরিত পায়ে ধর্মতলার দিকে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু কোথায় তাঁর—তনিমা? ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে কোথাও সে তাকে দেখতে পেলো না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ধর্মতলার মোড়ে। কিন্তু এখানেও সে নেই। হাঁটতে লাগলো দক্ষিণ দিকে। প্রতিটি বাস-স্টপ সে খুজে-খুঁজে দেখলো, কোথাও তার সাক্ষাৎ মিললো না। নিশ্চয়ই সে ওর জন্য দাঁড়ায় নি, বাস ধরে চলে গেছে। দক্ষিণে গেছে, কি, উত্তরে গেছে, কে জানে!

চতুর্থ দিনে, যখন দেখা হবে তার সঙ্গে, তখন প্রথমেই সে প্রশ্ন করবে,—একটুও দাঁড়াতে পারলে না আমার জন্যে?

॥ ৮ ॥

রাত প্রায় দশটা। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে—একটা গলিঘুঁজির মধ্যে, একটা টিনের-চাল-ইটের-গাঁথুনি বহু ভাড়াটে-অধ্যুষিত বাড়ীর সামনে এসে কড়া নাড়লো ছেলেটি,—যার নাম মেয়েটি রেখেছিল,—অতনু।

দরজা খুলে দিলো বাড়ীর অন্য লোক। হেঁটে, নিজেদের ঘরে উঠতেই অন্ধকার বারান্দার কোণ থেকে তার বিধবা মা বলে উঠলো,—টাকা পেয়েছিস খোকা?

খোকা চুপ করে রইলো। মা আর কিছু বললেন না। সে ভিতরে ঢুকলো। ছোট ভাই দুটি ঘুমুচ্ছে, বোনটি জেগে আছে। এই বোনটি ছাড়া আরও দুটি বোন আছে তার,—তাদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোনক্রমে। এটির বয়সও উনিশ ছাড়িয়েছে,—স্কুলে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, স্কুলের মাইনে নিয়মিত দিতে পারা যায়নি বলে।

সুলতা ওর ভালো নাম, ডাকে সবাই 'লতি-লতি' বলে। বাড়ীতে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বই নিয়ে বসবার চেষ্টা করে, দাদাকে বলে,—ভেবো না দাদা, আমি প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবো।

সুলতার হাতে জামাটা খুলে দিলো, বললো, রেখে দে।

জামাটা আলনায় তুলে রাখতে-রাখতে সুলতা বললে,—মাকে আজ ভীষণ অপমান করে গেছে, বাড়ীওলা।

ক্লান্ত হয়ে তক্তপোষের প্রান্তে বসে পড়লো ছেলেটি। সুলতা ওর দিকে একটা ধুতি এগিয়ে দিতে-দিতে বললে,—প্যাণ্টটা একেবারে ছেড়ে নিলে পারতে।

নিশ্চুপে প্যাণ্টটা ছেড়ে ফেললো সে। বোন বললে,—গেঞ্জিটাও খুলে ফেলো। গরম লাগছে না?

—থাক্,—বলে আবার বসে পড়লো ছেলেটি, বললে,—একগ্লাস জল খাওয়া ত?

পুরো গ্লাসটা শেষ করে ছেলেটি বললে,—মা বাইরে কেন?

—জপে বসেছে।

ছেলেটি বললো,—মুদি এসেছিল?

—আসেনি! রোজ এসে ঘুরে যাচ্ছে।

ছেলেটি বললে,—ঠিক আছে, আজ থেকে ঠিক চারদিনের দিন রাত্রে সবাইকে সব শোধ করে দেবো। কাল সকালেই যাবো বাড়ীওয়ালার কাছে। বুঝলি?

সুলতা বললে,—টুকরো-টুক্‌রা কাজ না করে একটা চাকরীর চেষ্টা দেখো না, ভালো করে?

ছেলেটি বললে,—পাচ্ছি কই? সাধে কি আর টুকরো-টাকরা কাজ নিয়ে আছি?

সুলতা বললে,—ভাত বাড়ি?

আশ্চর্য হয়ে ছেলেটি বললে,—ভাত। ভাত কোথায় পেলি?

সুলতা বললো,—আমাদের সব রুটি। তুমি ত আবার ভাত ছাড়া খেতে পারো না?

—সে যাই হোক, পেলি কোথায়?

সুলতা বললে,—পাশের ঘরের মাসীমা আজ রেশন তুলেছে, এককৌটো চাল ধার দিয়েছে আর কী!

—তার মানে কাল দুবেলাই রুটি ত?

সুলতা আবার বললে,—তাছাড়া আবার কী!

—আমাদের রেশন ত এ-সপ্তাহে আনা হয় নি, না?

—কী করে আনা হবে? টাকা কই?

—দাঁড়া, দেখছি কাল—বলতে বলতে অতিকষ্টে নিজের দেহটাকে তক্তপোষের ওপর এলিয়ে দিতে গেল ছেলেটি। ওর বোন ওর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললে,—শুলে যে? খাবে না?

আবার তেমনি কষ্ট করেই উঠে বসলো ছেলেটি, বললে,—আচ্ছা দে!

একটা তরকারী আর ভাত, নুন, আর কাঁচা লঙ্কা। ছেলেটি খেতে খেতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। ওর বোন একটা পাখা নিয়ে এসে বাতাস করতে লাগলো।

—তোদের খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—মার?

সুলতা বললে,—মার আজ একাদশী।

ছেলেটি মুখ তুলে বললে,—সাগুদানা আছে ত?

—আছে।

ছেলেটি আবার খেতে খেতে বললে,—হঠাৎ বাতাস করছিস যে?

বোন বললে,—কুল্‌কুল্‌ করে ঘামছো যে! এমন ঘামতেও কখনো তোমাকে দেখি নি! কী হয়েছে বলো ত? গেঞ্জিটাও খুললে না।

ছেলেটি কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলো। তারপরে উঠে, কলতলা ঘুরে যখন আবার ঘরে এসে ঢুকলো, মায়ের জপ তখনো শেষ হয়নি, সুলতা এঁটো বাসন উঠোনে রেখে মেঝেটা নিকিয়ে নিচ্ছে।

খাটের প্রান্তে আবার এসে বসলো ছেলেটি। হাতের কাজ সেরে সুলতা একটু মৌরী এনে ওর দাদার হাতে দিলো, বললো,—গেঞ্জিটা খোলো।

ছেলেটি বললে,—খুলছি, কিন্তু যদি কিছু দেখিস, চেঁচাস না!

—কী হয়েছে?

—কিছুই নয়,—বলতে বলতে অতি কষ্টে গেঞ্জিটা খুললো ছেলেটি। সুলতার চোখে পড়লো পিঠের ফোলা-ফোলা দাগ।

কঁকিয়ে উঠলো ওর বোন,—এ কী!

—চুপ,—ছেলেটি বললে,—একটা গুণ্ডার দলে গিয়ে পড়েছিলাম। আমিও দিয়েছি ঘা-কতক। চেঁচাস না, মা শুনলে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেবে। চোখে অবশ্য দেখতে পাবে না, রাত্রে তেমন চোখে দেখতে পায় না মা, এই যা রক্ষে!

বোন আর কিছু বললো না। মা ঘরে এলো অনেকক্ষণ পরে। বললো,—পাস নি কিছু?

ছেলে উত্তর দিলো,—না মা, তবে যাতে পাই তার ব্যবস্থা করে এলাম। আজ থেকে ঠিক চতুর্থ দিন, রাত্রিবেলা,—তোমার হাতে নিশ্চয়ই টাকা তুলে দেবো, অনেক টাকা।

সংসারের দৈনন্দিন রথচক্র যথারীতি গড়িয়ে চলে। পরদিন ভোরে উঠে দিন-পঞ্জী লিখতে গিয়ে সলোমন-প্রদত্ত অগ্রিম একশো টাকার হিসাবটা আবার দেখতে লাগলো ছেলেটি। দিনপঞ্জীর অর্থ ছোট একটি নোট বই,—তাতে হিসেব ছাড়া আর কিছুই লিখতো না সে কখনো। পিছন দিককার নির্দিষ্ট পাতায় কার সঙ্গে কখন তার সাক্ষাৎ করবার কথা, সেই সব লিখে রাখত মাত্র। আজ কিন্তু তার অন্য সব কথা লিখতে ইচ্ছা করতে লাগলো। একশো টাকায় সে পুরানো দেনাই শোধ করেছে। পাশের ঘরের মাসীমাকেই সে শোধ করেছে সুদ সমেত পঁয়ষট্টি টাকা। ভাগ্যে শোধ করেছিল, নইলে কাল রাত্রে তিনি কি এককৌটো চাল ধার দিতেন?

ভাইরা তখনো ওঠেনি, মা আর বোন উঠেছে শুধু। মা গেছেন গঙ্গায় চান করতে। রোজই করেন। বোন কলতলায় বাসনমাজা শেষ করে এইমাত্র ঘরে ফিরলো। দাদা তন্ময় হয়ে নোট বইতে কী লিখছে দেখে, পিছন থেকে উঁকি দিলো।

কী লিখছো দাদা ?

সাধারণভাবেই প্রশ্নটা করা। কিন্তু এমন চমকে সে কেঁপে উঠলো যে বলার নয়। সুলতার ভ্রূ দুটো একটু কুঞ্চিত হলো। তার দাদা চট্ করে নোট বইটা বন্ধ করে ফেললো। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে,—হ্যাঁরে লতি, অতনু নামটা কেমন রে ?

—ভালো। কেন বলো ত ?

—আমার নামটা বদলে 'অতনু' রাখবো।

—ওমা, কেন ? অমিয় নামটা কী খারাপ ?

অমিয় (অথবা, অতনু) বললে,—স্ক্রিন নেম্ বুঝলি ? ফিল্মে নামতে গেলে একটা লাগসই নাম দরকার। ও অমিয়-টমিয়তে কুলোবে না।

সুলতা মুখ গম্ভীর করে বললে,—আবার কেউ নাচিয়েছে বুঝি ?

—দূর তা' কেন ?

সুলতা বললে,—দেখ দাদা, ওসব দিকে আর ঘুরো না, অন্য কিছু করতে পারো কি না দেখ।

অমিয় উঠে দাঁড়ালো, বললে,—হ্যাঁ, তাই করবো।

—যাচ্ছো কোথায় ?

—বাড়ীওয়ালার কাছে। আবার না এসে হাম্‌লা শুরু করে দেয় !

—কী করে থামাবে ?

অমিয় বললে,—আজ থেকে চতুর্থ দিনে, না না, একটা দিন ত

কেটেই গেল, আজ থেকে তৃতীয় দিন রাত্রে তার সব বাকী টাকা দিয়ে দেবো, বলে আসবো।

সুলতা বললে,—কোথা থেকে টাকা পাবে দাদা?

অমিয় বললে,—কোথা থেকে আবার! চুরি-চামারি নিশ্চয়ই নয়।

সুলতা খপ্ করে দাদার হাতটা চেপে ধরলো, ছলছল চোখে বললো,—আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না দাদা।

ওর মাথায় সস্নেহে একটু নাড়া দিয়ে অমিয় বললে,—দূর পাগলী! এ-কথা ভাবছিস কেন?

সুলতার চোখ দিয়ে টপ্ করে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, বললে, গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারি করতে যেও না।

ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সে বললে,—তোর কোন ভয় নেই রে। আর যাই করি, চুরি-ডাকাতি-গুণ্ডামী করে টাকা উপায় করতে যাবো না, একথা বিশ্বাস করিস।

সুলতা মুখ নীচু করলো, বললো,—আমি যদি কিছু রোজগার করতে পারতাম!

অমিয় হেসে ওর চিবুক ধরে ওর মুখখানা তুলে বললে,—তা আর নয়! ওসব কথা ভাবিস না। হ্যাঁরে, মা কিছু বলছিল নাকি রে? আমার পিঠের দাগ দেখেছে?

—তা আর দেখে নি?—সুলতা বললে,—মায়ের মন ত! ঠিক জানতে পারে।

—কী? কী জেনেছে মা?

সুলতা বললে,—ভোরে উঠেই মা আমাকে বললে, তুমি তখন ঘুমোচ্ছো; বললে,—ওকে কারা মেরেছে। কিন্তু কেন? ও তো কারুর ওপর কোনো অন্যায় করার ছেলে নয়? তবে কি—

বোন থামতেই অমিয় বললে,—তবে, কী ?

বোন বললে,—সেদিন যে তুমি একশো টাকা আনলে, সেজন্য কিছু নয় ত ? মা সে কথাই বলছিল।

অমিয় বললে,—নারে, তুই মাকে বুঝিয়ে বলিস ! আমি এখন চললাম, কেমন ?

সংসারের নানান সমস্যায় এমনিভাবেই বিব্রত রইলো অমিয়। তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। দেখতে দেখতে এলো সেই নির্দিষ্ট দিন। ভালো করে দাড়ি কামিয়ে শার্ট, প্যান্ট পরে বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লো সে। পিঠের ব্যথাও নেই, ক্ষতও নেই, কিন্তু দাগ এখনো আছে। এই দাগ দেখে—

অতনু মনে মনে বলতে লাগলো,—এই দাগ দেখে আজ তুমি কী বলবে তনিমা ? আজ যা-ই তুমি বলো, আজ টাকার জন্য সব কিছুই করতে আমি রাজী হবো। সবাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি আজ রাত্রে টাকা দেবো বলে। টাকাটা না পেলে কী হবে বলো ত ? কিন্তু একটা কথা, ও জিনিস আমি আর খাবো না। খেলে মারা যাবো। সেদিন খাবার পরই মনে হচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো বুঝি !

॥ ৯ ॥

ভাবতে-ভাবতে সলোমনের স্টুডিওতে যখন সে গিয়ে উপস্থিত হলো, তখন চারটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। যথারীতি তার আসনে বসেছিল সলোমন। ওকে দেখে তেমনিভাবে মাছের মতো চোখ মেলে তাকালো। অতনুর মনে হলো, এখুনি বুঝি বলবে,—তোমার পার্টনারও আরলিয়ার এসেছে, যাও একেবারে ভিতরে চলে যাও।

কিন্তু তা সে বললো না। বললো,—বসো।

বসলো গিয়ে স্টুডিওরই একটা চেয়ারে। বললে, এসেছে ?

সলোমন বললে,—না, মলি এখনো আসে নি। তুমি ভেতরে গিয়ে বসবে ? এসো আমার সঙ্গে।

সেই চারদিনের আগের মতোই ঘটনা। তেমনি স্টুডিও ত্যাগ করে ভিতরের সেই ঘরটিতে গিয়ে বসা। অতনু একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর উঠে দাঁড়ালো। জামা খুললো, গেঞ্জি খুললো, সেই লুঙ্গিটা কেচে ইস্ত্রি করে রাখা ছিল। সেটি পরে সটান বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সে। বিছানাটা বেশ বিস্তৃত, একবার গড়াগড়ি দিয়ে নিলো। তারপরে তাকিয়ে দেখলো, মুভী ক্যামেরাটা যথাস্থানে বিরাজ করছে। আলোর স্ট্যাণ্ডগুলিও এনে রাখা হয়েছে।

তার কাছে ঘড়ি নেই, তবু তার মনে হলো, অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। চারটে নিশ্চয়ই বেজে গেছে অনেকক্ষণ। তনিমার হলো কী, এখনো আসছে না কেন!

পর্দাটা হঠাৎ নড়ে উঠলো এই সময়। কিন্তু না, তনিমা নয়, এলো সলোমনসাহেব ট্রে হাতে। চা, ডিমের অমলেট, টোস্ট ইত্যাদি। দুটি প্লেটে। বললে,—তোমারটা খেয়ে নাও, আর ওরটা রাখো ঢাকা দিয়ে।

—কটা বেজেছে ?

—সাড়ে চার।

—এলো না যে এখনো ?

—তাই ত দেখছি।

বলে, চলে গেলো সলোমন। অতনু উঠে খেয়েও নিলো। চা শেষ করে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আবার একটু গড়াগড়ি দিলো। না, পিঠে একটুও ব্যথা নেই, একটুও লাগছে না তার!

আবার সে ভাবতে লাগলো।—আচ্ছা, তোমার আসল নামটা কী? না থাক, দরকার নেই, তনিমাই ভালো। দেখ তনিমা, আজকেই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে, আবার আজকেই তা শেষ হয়ে যাবে। হয়ত আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। কোথায় তুমি থাকো তা-ও বলতে চাইলে না। কেন? বন্ধুত্ব হলে ক্ষতি কী?

পর্দাটা আবার দুলে উঠলো এক সময়। না, এবারও সে নয়, সলোমনসাহেব। বললে,—সাড়ে পাঁচটা বাজতে চললো, এখনো এলো না তোমার পার্টনার। দেখছো ত ব্যাপারটা? লেট্ আস ওয়েট্। দেখা যাক।

বলে, যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল সলোমন।

কিন্তু, এভাবে শুয়ে-শুয়ে আর কতক্ষণ কাটানো যায়? এপাশ-ওপাশ করে আধ ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেবার পর অতনু উঠে দাঁড়ালো। পা টিপে পা টিপে বাইরে এলো। পাশের ঘর

অন্ধকার। সলোমন নিশ্চয়ই এখনো তার সাজানো দোকানটিতে বসে আছে।

আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো অতনু। সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই আল্‌না, আলমারী। আলমারীটার দিকে চোখ পড়ায় সেই দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অতনু। চাবি দেওয়া ছিল না, পাল্লা ধরে টান দিতেই খুলে গেল। একটা তাকে তুলো, ব্যাণ্ডেজ, টাইওডিন, মলমের কৌটো ইত্যাদি। অন্য একটা তাকে, সেই রম্‌-এর আধখালি বোতলটা সাজানো রয়েছে। বোতলটা হাতে নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দেখলো। পাশে গেলাসও রয়েছে, ঢেলে নিয়ে জল মিশিয়ে একটু খাবে নাকি? এক চুমুকে নয়, ধীরে ধীরে, বসে বসে? হঠাৎই স্নলতার কথাটা মনে পড়ে গেল,—আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না দাদা।

ওর মন বলতে লাগলো,—বোকা মেয়ে! সর্বনাশ বলতে তুই কী বুঝিস? তোর চিন্তা-ভাবনাগুলো অন্যপথে চালিত কর্। বেঁচে থাকাটাই বড়ো কথা। এবং এই বেঁচে থাকবার জন্য মানুষকে আজ যে-কোনো মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তা জানিস?

বোতলটা আবার সে রেখে দিলো অবশ্য যথাস্থানে। আবার ফিরে এলো, বসলো গিয়ে সেই ইজিচেয়ারটিতে। সুইচ্ টিপে সেই ঘোমটাপরা টেবিল-ল্যাম্প্‌টা জ্বাললো, ঘুরিয়ে রাখলো। দরজার দিকে তার মুখ; তমিস্রা আসামাত্রই সে তার মুখের ওপরে ফেলবে।

কিন্তু কোথায় কে? মিনিটের পর মিনিট যায়, সে আর এলো না।

এলো আবার সলোমনসাহেব, বললে,—দোকান বন্ধ করে এলাম। রাত হয়ে গেল। ক্যামেরা যাঁর, সেই বিশিষ্ট মানুষটির লোক এসে পড়ার সময় হয়ে গেল। মলি আর এলো না। না, এ ব্যবসায় এখানেই ইতি।

মুখখানা পাংশু হয়ে গেল ছেলেটির। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো,—কী হবে। আমার যে টাকার দরকার। সবাইকে আজ দেবো বলে এসেছি।

সলোমন বললে,—ব্যবসা না হলে টাকা পাবে কোথা থেকে? উল্‌টে যে একশো টাকা অ্যাড্‌ভান্স নিয়েছো, সেটাই ফেরং দেওয়া উচিত।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সলোমনের হাত জড়িয়ে ধরলো, বললে,—না না, তা হয় না। কেন সে এলো না? তার ঠিকানা জানো না তুমি?

সলোমন বললে,—না। সত্যি ঠিকানা কেউ কি জানায়? আমিও জিজ্ঞাসা করি না। তোমার ঠিকানাই কি আমি জানি, না, জিজ্ঞাসা করেছি?

ব্যাকুল হয়ে ছেলেটি বললে,—তাহলে একটু সবুর করো, নিশ্চয় সে আসবে। তারও টাকার খুব দরকার।

সলোমন মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,—টাকার দরকার না থাকলে ভদ্রমেয়ে কখনো এ-ভাবে এদিকে পা বাড়ায়? সে-কথা আমিও জানি। সে কখনো এনগেজমেণ্ট ফেল্ করে না। তাছাড়া, তার সময় জ্ঞানও অদ্ভুত। আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তার কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে।

অতনু শঙ্কিত কণ্ঠে বললে,—তাহলে? কাল, কিংবা পরশু? পারো না আরেকটা ডেট্ নিতে?

সলোমন বললে,—না বাপু—আর আমি রিস্ক্-এর মধ্যে কিছুতেই যাবো না। দরকার নেই আমার টাকা রোজগারে। যে-ভাবে চলছিল, সেভাবেই আমার না হয় চলবে।

অতনু আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠলো,—মিস্টার সলোমন!

সলোমন যেতে যেতে দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালো, বললে,— কী ?

অতনু বললে,—আর কাউকে আনা যায় না ? আমি রাজী।

সলোমন পুরু ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু হাসলো, বললো,—সে যদি হতো, ত তোমাদের দুজনকে বেছে-বেছে এনগেজ করলুম কেন ? অল্প খরচে হয়ে যেতো। সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি, যিনি এ-অর্ডার আমায় দিয়েছেন, তিনি চান খাপ্সুরৎ ছেলেমেয়ে।

—কী আশ্চর্য! ক্যামেরার সামনে আবার সুন্দর-অসুন্দর কী ?

সলোমন বললে,—আছে বই কী! ফটোজেনিক ফেস যেমন দরকার হয় ছায়াছবিতে, এক্ষেত্রে দরকার ফটোজেনিক ফিগার। আমি ক্যামেরাম্যান, আমি সে-সব বুঝি, তোমরা বুঝবে না।

অতনু অধীর হয়ে বলে উঠলো,—কিন্তু, আর কোনো উপায় নেই কী ?

সলোমন বললে একটু চিন্তিত ভঙ্গীতে,—আনতে পারি দালালের সাহায্যে কোনো 'বাজারে মেয়েমানুষ'—কিন্তু, তুমি রাজী হবে কী ?

—নিশ্চয়ই রাজী।

—ভালো করে ভেবে বলছো ?

—হ্যাঁ।

সলোমন ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললে,—কিন্তু আমি রাজী নই। আমি ও-সব মেয়েদের বিশ্বাস করি না। যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে পুলিশের কাছে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। আমার স্টুডিওর ওপর পুলিশের নজর নেই, এ-কথা ভেবো না যেন।

ও তখনো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য ক'রে সলোমন বললে,—মাই বয়, এ-ছাড়াও অন্য কথা আছে। অভিজ্ঞতা নেই

বলেই তুমি তা জানো না। ওসব বাজারেদের কুৎসিত রোগটোগও ত থাকতে পারে? সুতরাং ডোণ্ট ইনসিস্ট।

অতনু বললে,—অতো সব দেখলে চলে না। আমার যে ভীষণ টাকার দরকার।

—আমারও।—সলোমন বললে,—কিন্তু তা বলে এত রকম বিপদের ঝুঁকি মাথার ওপর টেনে নিতে পারি না।

হতাশ হয়ে চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লো অতনু। সলোমন নীরবে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরেই। অতনু চমকে বললে,—এসেছে।

মাথা নেড়ে সলোমন বললে,—না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বিছানার প্রান্তে বসলো সলোমন। বললে,—এখানে এসো। কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে।

কাছে এসে বসলো অতনু। সলোমন বললে,—ওর দুটো আঙুল কেটে গিয়েছিল জানো?

—জানি।

সলোমন বললে,—কাঁদতে কাঁদতে নিজের আঙুল দুটো মুখে পুরে যে অমনভাবে কামড় বসিয়ে রক্তের ধারা বহাতে পারে, তাকে ঠিক সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে ফেলা যায় কী? ভাগ্যদোষে সে আমার মডেল-এর কাজ করছিল বটে, কিন্তু সে ঠিক হেলাফেলা করবার মেয়ে নয়।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অতনু বলে উঠলো,—তুমি বলতে চাও কী, স্পষ্ট করে বলো।

সলোমন ওর কাঁধে হাত রাখলো, বললে,—আমার মনে হয়, ইচ্ছে করেই সে আজ আসেনি।

—কেন?

—অভাবের শত লাঞ্ছনা মাথায় নিয়েও সে আজ তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে।

সোজা হয়ে বসলো অতনু,—মানে!

সলোমন বললে,—বুড়ো হয়েছি, সংসারের দেখেছিও অনেক। যৌবনকালে মেয়েদের সঙ্গেও কম মেলামেশা করিনি! আমি সন্ধ্যে থেকেই ওর কথা ভেবে চলেছি। ভাবতে ভাবতে আমার এ-কথাই মনে হলো,—এ কুৎসিত ব্যাপারের মধ্যে সে আর তোমাকে টানতে চায় না।

—কেন?

সলোমন বললে,—তোমার ওপর বোধহয় তার একটা স্নেহ জন্মে গেছে।

—স্নেহ!

সলোমন হেসে বললে,—তবে কি, প্রেম? তা, এক ধরণের প্রেম-ও বলতে পারো।

উঠে দাঁড়ালো অতনু, বললে,—এ আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে সে জানলো না, শুনলো না—!

সলোমন মুখ নীচু করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপরে সে-ও উঠে দাঁড়ালো, বললে,—যতটুকু সে জেনেছে সেইটুকুই হয়ত তার পক্ষে যথেষ্ট! কে বলতে পারে? অবশ্য আমার ধারণাটা ভুলও হতে পারে। বেশ ত, একটা পরীক্ষা করবে? আমি লোকটার হাতে-পায়ে ধরে ক্যামেরাটা আরও একটা দিন ধরে রাখছি, দেখা যাক্, কাল সে আসে কিনা! যদি আসে ত বুঝবো,—অসুস্থতার জন্য আজ সে আসতে পারে নি। আর যদি না আসে ত বুঝবে,—আমার অনুমানই সত্য।

বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে তাকালো সলোমন, বললে,—একটু বসো। বোধহয় সে-লোকটি এসেছে।

বসে রইলো ছেলেটি মিনিট পনেরো। সলোমন এলো তারপরে বললে,—এই লাস্ট্ চান্স। অর্থাৎ, কাল। কাল না হলে এ-ব্যবসা আমার হাত থেকে চলে যাবে অন্যের হাতে। লোকটাকে বলে-কয়ে কালকের রাত্রিটা পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছি।

॥ ১০ ॥

—কী রে, টাকা পেলি?

বাড়ী ফেরামাত্রই মার প্রশ্ন। আর, এ-প্রশ্ন উচ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। অমিয় বললে,—না মা, তবে পাবোই। আমি যাচ্ছি বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে।

শুধু বাড়ীওয়ালা কেন, সব পাওনাদারের সঙ্গে দেখা করে আর একটা দিন চেয়ে নিয়েছিল অমিয়। তার ধারণা ছিল, কাল যে-কারণেই হোক তনিমা আসতে পারেনি, আজ সে আসবেই. মিষ্টার সলোমনের কথা তার কানের কাছে ভ্রমরের মতো বারবার গুঞ্জন যে তোলে নি এমন নয়, কিন্তু তাকে সে মন থেকে কিছুতেই আমল দিতে পারেনি।

যাই হোক, চারটে বাজতে না বাজতেই অমিয় গিয়ে উপস্থিত হলো সলোমনের কাছে। তার আসনে বিমর্ষ হয়ে বসেছিল সলোমন, বললে,—আসে নি এখনো।

অমিয় বসে রইলো সেখানেই—চুপচাপ। একটুক্ষণ করে সময় যায়, আর সে জিজ্ঞাসা করে,—কটা বাজলো?

হাতঘড়ি দেখে উত্তর দেয় সলোমন। এমনি করে করে আধঘণ্টা কেটে যাবার পর আর থাকতে পারলো না অমিয় (বা, অতনু), সে বেরিয়ে পড়লো।

—কোথায় যাচ্ছো?

—বাস স্ট্যাণ্ডে। তাকে খুঁজবো।

—পাগল। কোন্ স্ট্যাণ্ডে তাকে খুঁজবে?

তবু, সে উন্মত্তের মতো তাকে এসপ্ল্যানেডের স্ট্যাণ্ডের কাছে খুঁজে বেড়ালো। কতো মহিলাকে সে যে মলি বা তনিমা বলে ভুল করলো, তার ইয়ত্তা নেই। ঘণ্টাখানেক এভাবে কাটিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলো সলোমনের কাছে।

প্রশ্ন করলো,—এসেছে কী?

—না। কিন্তু, তুমি? তুমি কী করলে? খুঁজে পেলে?

—না।

সলোমন বললে,—আমি আগেই বলেছিলুম। আমি যা অনুমান করেছি, ঠিক তাই। ও আসবে না।

অতনু ত্বরিত পায়ে ছুটে এলো সলোমনের কাছে, বললে,—কিন্তু আমি কী করবো? আজ টাকা না পেলে যে আমাকে সুইসাইড্ করতে হবে, তা জানো?

সলোমন শান্তভাবে মাথা নেড়ে বললে,—আই অ্যাম হেল্পলেশ।

অতনুর ইচ্ছে হলো নিজের বড়ো-বড়ো চুলগুলো টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।

পাগলের মতো বলতে লাগলো,—ফর গড্স সেক্, আর কাউকে তুমি ধরে আনো।

—না। কারণটা তোমাকে আগেই বলেছি।

অতনু বললে,—তাহলে আমাকে অনুমতি দাও, আমি খারাপ

পাড়ায় গিয়ে খারাপ কাউকে ধরে নিয়ে আসি। তুমি শুধু বলে দাও, কতো টাকার কথা বলবো?

সলোমন উঠে দাঁড়ালো, বললে,—অত সোজা নয়। ভয়ানক রিস্ক, তোমাকে আগেই বলেছি। ও-সব মেয়ে প্রায় প্রত্যেকেই স্পাই। তারপর, তুমি আনবার পর আমি যদি রিজেক্ট করি ত কথাই নেই। সেই প্রত্যাখানের রাগেই সে ছুটে যাবে থানায়। তুমি নিজেও বিপদে পড়বে, আমিও পড়বো। খুব জানাশুনা না থাকলে এ-সব কাজে টেনে আনতে নেই কাউকে। আমি বুড়োমানুষ, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তোমার থেকে ঢের বেশী।

অতনু বললে,—তাহলে কি কোনো উপায় নেই?

সলোমন ওর কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—সত্যিই কোনো উপায় নেই। তবে, তোমার স্যাটিস-ফেকশন-এর জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি। খালি স্টীল ছবি তুলবো বলে একটি মোটামুটি জানাশোনা মেয়েকে আমার দালাল মারফৎ নিয়ে আসছি। তুমি এমন পোজ করবে, যেন তুমি আমার ক্যামেরা-অ্যাসিস্‌ট্যান্ট, কেমন? যদি বুঝি সব দিক শুভ ও সুবিধাজনক, তখন তার কাছে আসল কাজের কথা তুলবো। কিন্তু, মাইণ্ড ইট্, টাকা পাবে কম। আড়াইশ'-র বেশী দিতে পারবো না, কারণ, আমিও পাবো কম। সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি, যাঁর কাজ আমি করছি, তিনি নিজে মলির ফিগার-এর ছবি দেখে পছন্দ করেছিলেন, এবং ঐ মোটা টাকায় রাজী হয়েছিলেন। নইলে, জানবে, তিনি নিজেও ঝানু বিজ্‌নেস্‌ম্যান্। অনেক রকমের বিজ্‌নেস্ আছে তাঁর।

অতনু বললে,—বুঝলাম। বিজ্‌নেস্‌ম্যানটির নাম বলতে পারো?

—সার্টেনলি নট্,—সলোমন বললে,—তুমি আমার আজকের

লোক, কিন্তু তিনি আমার চিরদিনের পেট্রন। তাঁকে আমি এক্সপোজ করতে পারি না। এটুকু জানবে, আমার ডানহাতের খবর বাঁহাত জানতে পারে না। আমার দালালটি পর্যন্ত জানে না আমার এই মুভী ছবি তোলার খবর। সে জানে, আমি মাঝে মাঝে স্টীল ছবি তুলে থাকি এই পর্যন্ত।

—বেশ,—অতনু বললে,—গো অ্যাহেড। তাড়াতাড়ি করো।

—বসে থাকো এইখানে,—বলে সলোমন চলে গেল গলি পার হয়ে বড়ো রাস্তায়। মিনিট পনেরো পর সে ফিরে এলো। বললে,—ব্যবস্থা করে এলাম। ব'সো, চা খাও। চায়ের কথা দোকানটায় বলে এসেছি।

একটা বয় চা নিয়ে এলো একটু পরেই। চা আর টোস্ট। এ-সব ব্যাপারে সলোমনের কার্পণ্য নেই।

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দোকানের আলোগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো সুইচের সাহায্যে।

আবার শুরু হলো অতনুর প্রশ্ন,—কটা বাজলো?

সলোমন পুরু ঠোঁটের ফাঁকে একটু হেসে বললে,—'ট্যারি এ লিট্‌ল মাই বয়।' তাড়াহুড়ো করলে চলে? মেয়েটা আবার কোথাও কোনো ডেট্ নিয়েছে কি না কে জানে!

অতনুর ভাগ্যই বলতে হবে, মেয়েটা আর আধঘণ্টা পরেই এসে পড়লো একটি রোগা লম্বা শার্ট-পায়জামা-পরা মোজা-বিক্রেতার সঙ্গে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেয়েটা চট্ করে ঢুকে পড়লো দোকানে, মোজা বিক্রেতাও চলে গেল ফিরে বড়ো রাস্তার দিকে।

শাদা জামার সঙ্গে গাঢ় হল্‌দে স্কার্টপরা একটি অ্যাংলো মেয়ে। ঝাঁকড়া চুল, মুখখানা অল্প একটু রঙকরা, চোখের কোণটা রঙে ঢাকা পড়ে গেছে, ঠোঁটে লিপস্টিক, হাতের নোখ্‌গুলো রঙকরা।

—হ্যালো—বলে সে সলোমনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সলোমন নীচু গলায় তাকে কী যেন বললো। মেয়েটা ঘুরে অতনুকে একবার দেখে নিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে সলোমনকে কী যেন বলতে লাগলো ফিস্‌ফিস্‌ করে।

সলোমন উঠে বাইরে এলো, তারপরে মেয়েটার হাত ধরে নিয়ে গেল স্টুডিওর ভিতরে। এক, দুই, তিন, করে অনেকগুলো মিনিট কাটতে লাগলো, আর অতনু টের পেলো, আবার সে ঘামতে আরম্ভ করেছে রীতিমত। পকেট থেকে রুমাল বার করে সজোরে সে ঘাম মুছতে লাগলো।

বেশ কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার পর সলোমন বাইরে এলো। তার নিজের আসনে না বসে বসলো এসে অতনুর পাশে। বললে,—ফিগার দেখলে? ক্যামেরার চোখে ফিগারই হচ্ছে আসল। নইলে স্টীল ছবিরও মূল্য নেই, মুভীরও মূল্য নেই।

অতনু বললে,—ফিগার ত ভালোই।

সলোমন তির্যক চোখে প্রশ্ন করলে,—মলির মতো?

অতনু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললে,—হ্যাঁ, তা' প্রায়।

বাঁকা হেসে সলোমন বললো,—লেট্‌ আস্‌ হোপ্‌ সো।

—কেন? হোপ্‌ কেন? ফিগার কি ভালো করে তাকিয়ে দেখো নি?

সলোমন হেসে বললে,—আমি আর্টিস্ট একথা ভুলো না। আমি দেখিনি? দেখেছি বলেই বলছি, আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

অতনু ভ্রূ-কুঁচকে ওর দিকে তাকালো। সলোমন বললে,—তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ। ছবি যদি সাধারণ ছায়াছবির হতো, তাহলে এই মেয়েই হয়তো নায়িকা হিসাবে চলে যেতো। সাধারণ ছায়াছবিতে পোশাকে-আশাকে ফিগার-এর অনেক দোষত্রুটিই ঢাকা পড়ে। এই ধরো না কেন, তোমার যদি একটু ভুঁড়ি থাকতো, পোশাকপরা অবস্থায় সে-ত্রুটি অনেক ঢাকা পড়ে যেতো,

কিন্তু, 'বেয়ার বডি'তে? ওঃ! হরিব্‌ল্‌। সেদিক থেকে ইয়োর ফিগার ইজ্‌ কোয়াইট্‌ ফটোজেনিক্‌।

অতনু একটুক্ষণ থেমে বললে,—কিন্তু আমরা বসে আছি কেন?

সলোমন বললে,—দাঁড়াও, মেয়েটা রেডি হয়ে নিক।

—রেডি মানে?

সলোমন হেসে বললে,—আমি ওকে 'আন্‌ড্রেস্‌ড্‌' হতে বলে এসেছি।

অতনু বুঝলো কথাটা। কিন্তু আর কিছু বললো না। রুমাল বার করে ঘাম মুছতে শুরু করলো শুধু। কয়েকটা মিনিট আরও পার হয়ে যাবার পর সলোমন উঠলো, স্টুডিওর বাইরে থেকে প্রশ্ন করলো,—রেডি?

ভিতর থেকে একটা জবাব ভেসে এলো। দূর থেকে অতনু তা বুঝলো না। সলোমন ওর দিকে তাকিয়ে বললে,—কাম্‌।

তারপরে, অতনু ওর কাছে আসতেই পর্দাটা তুলে ওরা দুজনে ভিতরে ঢুকে গেল। ভিতরের পর্দাগুলি সরিয়ে অন্দরের সেই ঘরখানায় যেতে হলো না, স্টুডিওতেই একটা টুলের ওপর বসে আছে মেয়েটি, নিঃসংকোচে। ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালো, পিছন ফিরলো।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো অতনু। এ যেন সম্পূর্ণ আরেকটি ফিগার,—স্কার্টপরা সেই তন্বী নিতম্বিনীই নয়!

সলোমনের আদেশে মেয়েটা এবার সামনে ফিরলো। বিশ্রী বিশ্রী। অতনু সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। শিথিল-তনু এক মূর্তিমতী কুশ্রীতা!

কিছুক্ষণ পরে সলোমন বাইরে এলো। অতনু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে চেয়ারে। বহুক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে

পারে নি। মেয়েটা পোশাক পরে বাইরে এলো, সলোমনের কাছ থেকে বোধহয় কয়েকটা টাকা নিলো, তারপরে বিরস-মুখে গলিতে পা দিয়ে ধীরে ধীরে বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

সলোমনও চুপ করে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে একসময়ে সে-ই নিজে নীরবতা ভঙ্গ করলো, বললো,—দেখলে ত? কয়েকটা টাকা আমার গচ্চা গেল, তা যাক, কিন্তু তুমি ত বুঝলে, অল্ দ্যাট্ গ্লিটারস্ ইজ নট্ গোল্ড? পোশাক-আশাকের নানান্ কারচুপি আছে। তুমিই বলো, এর স্টীল ফটো তুললেও কি তা কোনো কাজে আসতো?

অতনু বললে,—মেয়েটা অপমানিত বোধ করলো না ত?

—মোটেই না,—সলোমন বললে,—খারাপ মেয়েমানুষ। ওদের ও-সবের বালাই নেই। থাকলে চলবে কেন?

—যদি রেগেমেগে পুলিশের কাছে যায়?

—তা' যাবে না,—সলোমন বললে,—সেটুকু বিশ্বাস না থাকলে ডেকে পাঠালুম কেন? ওর বিজ্‌নেস্-এর ইন্‌টারেস্টেই ও যাবে না।

অতনু সোজা হয়ে বসলো, বললে,—আচ্ছা, আমাকেই বা বিশ্বাস করলে কি করে? আমার নামধামও তুমি জানো না।

সলোমন বললে,—তা জানি না, তবে তোমাকে ত সিনেমা স্টুডিওর চত্বরে দিনকয়েক দেখেছিলুম। তাছাড়া, তুমি কি করতে পারো আমার? কী প্রমাণ তুমি দেবে? এটুকু জেনো মাই বয়, এ-বিজনেসেও আমি আর হাত দিচ্ছি না। ন্যাস্টি বিজনেস হয়ত দেখবে, এ-স্টুডিওই আমি তুলে দিয়েছি। একা মানুষ, যা হোক একটা কিছু করে জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দেবো। স্টুডিওর এশ্‌টাব্লিশমেণ্টই আমি আর চালাতে পারছি না।

ওর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অতনু আবার

তার নিজের বাস্তব জগতে ফিরে এলো। অতি কষ্টে বললে,—কিন্তু মিষ্টার সলোমন, টাকা না পেলে আমিই বা করবো কি? সুইসাইড?

সলোমন নিজের চোখের ওপর হাতখানা রেখে চেয়ারের গায়ে এলিয়ে দিলো নিজেকে। তারপরে বললে,—আমি কতো গরীব, তা তুমি জানো না। আমিও বা তোমার কি করতে পারি বলো? ঠিক আছে, যে একশো টাকা তোমাকে আমি এ্যাডভান্স করে ছিলুম, তা আর তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না।

—মেনি থ্যাংক্‌স্।—অতনু বললে,—কিন্তু—

ও থেমে যেতেই সলোমন বললে,—মাই বয়, নিজের কথাই ভাবছো! কিন্তু শত হলেও তুমি পুরুষমানুষ। মলির কথা ভাবো ত? ভদ্রমেয়ে সে, কতো অভাবে পড়েই না তার মতো মেয়ে এ-পথে পা দিয়েছিল। সে এলো না, তার অর্থ হলো এই, সে অজস্র লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিলো। তার কথা একটু ভেবে, নিজের মনে বল আনবার চেষ্টা করো। কতোদিন আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। বলেছে,—কোনো একটা ভদ্র কাজ যদি পেতাম! আজ-কাল পাশ-টাশ করেও মেয়েরা চাকরী পাচ্ছে না, জানো মিস্টার সলোমন? আমার বাচ্চাটাকে আমি কী করে মানুষ করবো? আমার এই ফিগার কি চিরকাল থাকবে?

আমি কবিত্ব করে বলতাম,—তরুণীর তারুণ্য ক্ষণস্থায়ী বলেই আর্টের চোখে তার এত দাম! যুগ-যুগান্তর ধ'রে আর্ট একে অমর করে রাখবার চেষ্টা করছে। দা-ভিঞ্চি, গোয়া থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত কতো আর্টিস্ট এই সৌন্দর্যের বিশুদ্ধতাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার চেষ্টা করছে। বস্তুত আর্টের লক্ষ্যই তাই। যা সুন্দর অথচ স্বল্পস্থায়ী, তাকেই সে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চায়। সৌন্দর্য আর সত্যের স্মৃতিই ত মানুষের আর্টের ক্ষুধা মিটিয়ে এসেছে চিরকাল।

বলতে বলতে কী আশ্চর্য, সলোমনের মাছের মতো চোখের কোণে একবিন্দু জল দেখা গেল, বললে,—আর্টিস্ট যেমন ওর আর্টকে ভালোবাসে, ঠিক তেমনি এক ধরণের ভালোবাসা আমার জন্মে গেছে ওর ওপর মাই বয়। ঈশ্বর বোধহয় সেইজন্যই মুভীর কাজটা হ'তে দিলেন না। আমি ওর বহু স্টীল ফটো তুলেছি পেটের দায়ে, কিন্তু আমার ভিতরে একটা আর্টের তৃষ্ণাও আছে। শেষ পর্যন্ত মুভী আমি তুলতে পারতাম কি না কে জানে। হয়ত আমার জঘন্য লোভকে জয় করে আমার আর্টিস্ট সত্বাই বড়ো হয়ে দেখা দিতো। আজ আমি মুভী ক্যামেরাটা যথাস্থানে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবো।

॥ ১১ ॥

পরদিন জমা ছিল ওর দৈনন্দিন জীবনে চূড়ান্ত অপমান আর লাঞ্ছনা।

শেষ পর্যন্ত একটি কাবুলীর কাছ থেকে টাকা ধার করে তখনকার মতো ঋণমুক্ত হয়েছিল অমিয়।

মা চট্ করে বকাঝকা করেন না, তিনি পর্যন্ত কটূকথা বলতে ছাড়েন নি।

ওর বোন সুলতাও ওকে ভুল বুঝেছিল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু আশ্চর্য এক সংযম দেখা দিয়েছিল অমিয়র মধ্যে। কারুর কোন কটূবাক্যের সে উত্তর দেয় নি, কারুর কোনো তিরস্কারের সে প্রত্যুত্তর করে নি। বাজারের কাছে একটা কাবুলীর সঙ্গে দেখা করে সে তখনকার মতো দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবার ক্ষীণ প্রয়াসে নিযুক্ত হয়েছিল।

এ-সবের অন্তরালে কাজ করেছে তার মন। তনিমা নামক আশ্চর্য এক মেয়ের স্মৃতিই তাকে এ শক্তি দান করেছে বলতে হবে।

দেখতে দেখতে একটি মাস, তুটি মাস করে ছ-টি মাস কেটে গেল, শহরের পথে ঘাটে কখনো তার দেখা পায় নি সে।

টুকরো-টাকরো সিনেমার কাজ করেছে, কাবুলীর সুদের টাকা চুপি চুপি দিয়ে এসেছে, সংসার চলেছে অতি কষ্টে চরম অভাবের মধ্যে, তবু ভেঙে পড়ে নি অমিয়।

জাহাজঘাটায় গিয়ে তু'একদিনের অস্থায়ী কাজ করেছে টালি-ক্লার্কের, এখানে-ওখানে ধর্না দিয়েছে কাজের জন্য, কিন্তু সে-সব ফিরিস্তি না দেওয়াই বোধ হয় ভালো।

মাস ছয়েক পর একবার সলোমন স্টুড়িওর গলিতেও হানা দিয়েছিল অমিয়। সেই স্টুডিওটা উঠে গেছে, তার বদলে হয়েছে একটা লণ্ড্রী,—সলোমনসাহেব কোথায় চলে গেছে, তার সন্ধান পর্যন্ত কেউ দিতে পারলো না।

সংসার অচল হয়ে পড়েছে, অমিয় কিন্তু ভেঙে না পড়ে সকাল-সন্ধ্যে এটা-ওটা-সেটা কাজ করে কিছু আনবার চেষ্টা করছে, এখানে ওখানে দেখা সাক্ষাৎ করে কাজকর্ম জোগাড় করবার চেষ্টায় আছে। সারা দিনরাত যাই সে করুক, মনের মধ্যে একটি চিন্তা তার নিয়ত ঘোরাফেরা করে,—তনিমা গেল কোথায়? কলকাতার জনপথে কোথাও কি তার দেখা পাবে না এক মুহূর্তের জন্য?

ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তাকে খুঁজে বার করা যেন একটা বিলাসে পরিণত হয়েছে অমিয়র জীবনে।

একদিন দৈবাৎ সেই মোজা-বিক্রেতা লোকটির সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল অমিয়র। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে,—সলোমন-সাহেব কোথায় গেছে জানো?

—পাঞ্জিম।

—সে আবার কোথায়?

—গোয়া।

অমিয় আবার জিজ্ঞাসা করেছিল,—এখানকার পাট তুলে দিয়েছে?

—জী হাঁ।

বলতে বলতে তাকে নিয়ে গলির একটু নিভৃত অংশে চলে গিয়েছিল,—সাহেবের সম্বন্ধে এত খোঁজখবর নিচ্ছেন কেন স্যর?

—দরকার ছিল।

—পাওনাদার নাকি আপনি?

অমিয় বলেছিল,—না না। আমি তার কাছে আসতাম,—মাঝে মাঝে,—তুমি হয়ত দেখে থাকবে।

—জরুর, আপনাকে আমি বারকয়েক দেখেছি।

বলেই নিম্নকণ্ঠে,—ছোকরীর দরকার?

ছিঃ ছিঃ, না—বলে চলে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো অমিয়. নিম্নকণ্ঠে বললে,—হ্যাঁ, দরকার। একটি মেয়ের খোঁজ দিতে পারো?

—কোন্ মেয়ে?

অমিয় বললে,—সলোমনের কাছে আসতো—মলি ছিল তার নাম। মডেল। তোমার মনে আছে তাকে?

একটুক্ষণ ভ্রূ-কুঁচকে কী যেন ভাবলো লোকটা, বললে,—সেই বাঙালী মেয়েটা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বাঙালীই।

ফট্ করে তার পকেট থেকে একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুরানো নোটবই বার করলো লোকটা। সেটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখলো সে, তারপরে একটা পাতা উল্‌টে পড়তে পড়তে একসময় বলে উঠলো,—ও, সেই টালিগঞ্জওয়ালীর কথা বলছেন?

—তার বাড়ী কোথায় জানি না। টালিগঞ্জই হবে হয়ত। তাকে—

বাধা দিয়ে লোকটি বললে,—তার 'ইয়াদ' ছেড়ে দিন স্যর, সে এ-সব কাম করে না—

—তুমি কী করে জানলে?

লোকটি পান-খাওয়া মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসলো, বললে,—আমি জানি সব। বেওসার খাতিরে আমাকে সবার সবকুছ—ঠিকানা-উকানা জান্‌তে হয়।

অমিয় বললে,—সলোমন তার ঠিকানা জানে না, আর জানো তুমি?

—জী হাঁ!—সে বললে,—আপনার ভী ঠিকানা জানি।

—কী রকম?—অমিয় অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

লোকটি বললে,—সলোমন আমার একটা পার্টি শুধু, লেকিন আমার আরো অনেক পার্টি আছে স্যর। কখন কী কাজে লেগে যান, এইজন্য আপনার পাছু-পাছু একদিন কি ফলো করিনি স্যর?

বলে, অমিয়র ঠিকানা তার নোট বইয়ের সাহায্যে নির্ভুল ভাবে বলে দিলো তাকে।

অমিয় উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। বললে,—সেই বাঙালী মেয়েটার ঠিকানাও বুঝি অমনি তার অলক্ষ্যে তাকে ফলো করে জেনেছিলে?

সে আবার হাসলো, বললো,—জী হাঁ।

অমিয় বললে,—এতোটা জানো, আমাদের আসল নাম-টামগুলো জানো না?

—তা-ও জানি স্যর,—লোকটি বললে,—আপনার নাম—অমিয় মুখার্জী।

চমকে উঠলো অমিয়। বললে,—সলোমন জানতো?

—জী না,—লোকটি বললে,—লেকিন্ ইদানী সন্দেহ করছিল। তাই ত ভয় পেয়ে বেওসা-টেওসা ছেড়ে চলে গেল পাঞ্জিম।

—সন্দেহ? সন্দেহ কেন?

লোকটি আবার হাসলো। বললে,—আমাকে পুলিশের এক নিস্‌পেক্টরবাবুর সাথ কথা বলতে দেখেছিল একদিন। সলোমনসাহেব বহুৎ হুঁশিয়ার আদমী। নইলে, আপনাকে নিয়ে যে ব্লু-ফিল্মীর বেওসার দাঁওটা মারতে গিয়েছিল, সেটা অমন হাতে পেয়েও ছেড়ে দেয়!

অমিয় রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিল ওর কথা, বললে,—তুমি—তুমি স্পাই?

—না বাবু,—লোকটি গম্ভীর হয়ে বললে,—আমি ইন্‌ফর্মারের কাম করি মাঝে মাঝে। আপনি এ-লাইনে বেশী ঘুর-ঘুর করবেন না। ভালো আদমী, কোথায় কোন্ গাড্ডায় পড়ে যাবেন, কে জানে!

অমিয় হাঁ করে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে আবার একটু হেসে বললে,—সলোমনসাহেবের কাণ্ড! বেছে-বেছে আপনাকে বার করলো ঐ কামটার জন্য। ওর জন্য আদমী দরকার আমি দিতুম। সে-সব হচ্ছে পাকা আদমী।

অমিয় জিজ্ঞাসা করলো,—আচ্ছা, সেই বাঙালী মেয়েটার নাম ঠিকানা আমাকে দিতে পারো?

লোকটি তার নোটবই খুলে একটা পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টালিগঞ্জ অঞ্চলের একটা ঠিকানার উল্লেখ করলো, তারপরে বললে —মেয়েটার নামও জানতেন না? সুজাতা দত্ত।

অমিয় আর দাঁড়ালো না, চট্ করে সরে এলো ওর কাছ থেকে লোকটা আড়চোখে ওকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো, তারপরে চলে গেল নিজের ধান্দায়, ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো,

বহুৎ আচ্ছা মোজা হ্যায় বাবু, বহুৎ সস্তা। লিয়ে যান বাবু, আভি লিয়ে যান।

॥ ১২ ॥

সুজাতা?

সুজাতা, না তনিমা,—কোন্ নামটা সুন্দর?

কিন্তু সে কথা ভাববার অবসর কতটুকু?

উদয়াস্ত ঘোরাঘুরি আর টুকিটাকি কাজ করতে করতে সাতদিন কেটে গেল।

সাত-সাতটা দিনের আগে সে কিছুতেই সময় করতে পারলো না টালিগঞ্জ যাবার।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা বরাবর পূবমুখী চলে গেছে 'রাণীকুঠি-'র দিকে কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনী পার হয়ে,—সেই রাস্তা দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পর, একটি বড়ো বটগাছ-ওয়ালা মোড়ের কাছে বাঁদিকে নেমে গেছে ইটের খোয়া দিয়ে তৈরী সরু একটা রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে কয়েকটা বাঁক ঘুরতেই খুঁজে পাওয়া গেল বাড়ীটা। এ অঞ্চলের বাড়ীর নম্বরগুলোও উল্টো-পাল্টা করে বসানো,—খুঁজে বার করা খুবই কঠিন।

বাড়ীটা একতলা, একটা ব্যারাক-বাড়ীর মতো, দেওয়াল পাকা, মাথায় অ্যাসবেস্টাস বসানো। সদর বলে একটা দরজা আছে, তারই গায়ে নম্বর বসানো। দরজাটা খোলাই ছিল, হয়ত বা সারাদিন খোলাই থাকে। দরজার বাইরে একটা ছোট্ট রকের মতো, সেখানে বসে একটি কালোমতন আধাবুড়ো লোক খবরের কাগজ পড়ছে। দিনটা ছিল অবশ্য রবিবার, বেলা প্রায় দশটার

কাছাকাছি। নম্বরটা বেশ করে দেখে নিয়ে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অমিয়।

লোকটি মুখ তুলে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে,—কারে চান?

—সুজাতা দত্ত।

—দত্ত?—লোকটি ভ্রূ কুঁচকে গেল,— দত্ত আবার এখানে থাকে কেডা?

অমিয় ভারিক্কী চালে বললো,—আসল নামটা কানে গেছে কি? সুজাতা। মেয়েছেলে।

চোখ বড়ো বড়ো করে লোকটি বললে,—মেয়েছেলে!

—আজ্ঞে।

লোকটি বললে,—তা তিনি হন কে আপনার?

—আত্মীয়া।

লোকটি এবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলো,—ও মনুর মা, একটু বাইরে আসো দেখি!

একটি প্রৌঢ়া শীর্ণা সধবা মহিলা ঘোমটা বড়ো করে টেনে জড়িত পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চুপসানো গাল, কুঞ্চিত ললাটপ্রদেশ, ভদ্রমহিলা তার উপস্থিতি আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন মনে হয়। তবু লোকটির উদ্দেশ্যেই মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—ডাকো ক্যান্?

ততক্ষণ ভিতর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেছে।

—সুজাতা কেডা?—লোকটি মহিলাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো,—ইনি তার আত্মীয়। খুঁজ্তেছেন।

মহিলাটি তার দিকে আরেকবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটির কাছে গিয়ে ফিস্ফিস্ করে কী যেন বললেন।

'অ্যাঁ!' বলে লোকটি তার চোখদুটি প্রায় কপালে তুললো বলা যায়।

মহিলাটি হাত নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে আরোও কী কী সব যেন বললেন লোকটিকে, তারপর অন্দরে চলে গেলেন ত্বরিত পায়ে।

লোকটি এবার হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,—আপনি তার আত্মীয় বললেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

লোকটি খবরের কাগজটা মুড়ে রাখতে রাখতে বলে উঠলো,—তা' এতদিন ছ্যালেন কোথায়? ছ-সাতমাস আগে?

—কেন?

লোকটি বললো,—মাইয়াডা' কোন্ আপিসে যেন কাজকম্ম করতো তাই না? সক্কাল নয়টায় বাইরাইয়া ফিরতো হেই যারে বলে রাত ন-টায়। এউক্যা মাইয়া ছিল, তারে কোন্ বোডিং-টোডিংএ রাখছিল, পেল্লায় তার খরচ। ছয়-সাতমাস হইয়া গেল, একদিন রাত্তিরে ফিরা আইস্যা দেখে,—বাড়ীওয়ালা প্যায়দা লইয়া আইস্যা ঘর-দুয়ারের যাতীয় জিনিসপত্তর ছড়াইয়া ছত্রাখ্যান কইরা দিয়া দরজায় তালাবন্ধ কইরা দিছে।

—কেন?

—বাড়ীওয়ালার বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ছিল অনেক,—লোকটি বললে,—সেই সব আর কি কমু? মামলা-আদালত-উকিল-মুহুরী—

ঠিক এই সময় সেই ঘোমটা-টানা প্রৌঢ়া মহিলাটি আবার বাইরে এলেন। লোকটি সম্ভবত তাঁর স্বামী। স্বামীর হাতে একখানা পুরানো মলাট-ছেঁড়া এক্সারসাইজ বুক তুলে দিলেন। তার শেষের দিকের একটা পৃষ্ঠা খুলে লোকটি বললো, —প্রতিদিন রাত্তিরে আমাগো সংসারের খরচ লিখ্যা দিতো নিজের হাতে। এই দেখেন তার হাতের লেখা—

অমিয়র সামনে গোটা-গোটা অক্ষরের হিসেবগুলো যেন ঝাপসা দেখাচ্ছিল। লোকটি শেষ পৃষ্ঠাটি তার দিকে তুলে ধরে দেখাতে দেখাতে বললো,—বড়ো ভালো মাইয়া ছেল। একটা পেট, কোনো ঝি নাই কিছু নাই—নিজের হাতে নিজের কাজ করতো সময়মতো আমাগো সংসারের কাজও কইরা দিতো। এই দেখেন, এই শেষ তারিখ। এই তারিখের পর আর হিসাব লেখা নাই। হিসাব লিখবো কখন? রাত্তিরে আইস্যা লিখা দিতো, তা সেই রাত্তিরে ত তার ঘর তালাবন্ধ কইরা দিছে বাড়ীওলা। মাইয়াডা করলো কী, জিনিসপত্তর আমাগো কাছে রাইখ্যা একখান্মাত্র সুটকেশ সম্বল কইরা তার পরদিন ভোরবেলায় কোথায় যে চইলা গেল, তার ঠিকানা নাই। পত্তরও দেয় নাই, জিনিসপত্তরও লইতে আসে নাই। তারিখটা দেখেন, যেটা খাতায় লিখা আছে?

অমিয় দেখলো ঝুঁকে। লোকটি বললে,—পরের দিনের তারিখটার কথা ভাবেন, সে রাইত নয়টার পর খাইটা-খুইটা আইলো। দরজায় তালাবন্ধ, আমাগো ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাইত্যা শুইয়া কাটাইল সেই রাত্তিরটা, ব্যস্, আর তার কোনো সন্ধান নাই।

তারিখটা মনে মনে মিলিয়ে দেখলো অমিয়। প্রায় সাত মাসই হবে। সে নিজেও কি ভুলতে পারবে সেই অভূতপূর্ব দিনটির কথা? সেই রাত্রে সে ফিরে এসে তার ঘরের এই শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, এবং পরদিন সুটকেশ হাতে পথে বেরিয়ে যায়।

তার অভাবের কথাটা এখানে স্পষ্টই এসে পড়ে। কিন্তু এই প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও সে পূর্ব নির্দিষ্ট চতুর্থ দিনটিতে সলোমনসাহেবের স্টুডিওতে গিয়ে পৌঁছলো না কেন?

এই সব প্রশ্নের ভার মনের মধ্যে বহন করেই সেদিন টালিগঞ্জ থেকে ফিরে এসেছিল অমিয়। মনে মনে বলেছিল,—তুমি তো আসতে পারতে। তোমার আসা উচিত ছিল। বোর্ডিং-এ মেয়েদে

রেখেছো, তার খরচও যদি প্রচুর হয়ে থাকে, ত, উপার্জনের এই মোটা অঙ্ককে তুমি উপেক্ষা করলে কী ভাবে ?

এই ধরণের কথাগুলিই তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে বেড়াতে লাগলো ক'দিন ধরে। এবং এই চিন্তায় সে এমন মগ্ন ছিল, যে, তার সংসারে যে এক বিপুল পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে, তা তার মনোযোগ একেবারেই আকর্ষণ করেনি।

যখন চোখে পড়লো, তখন তার বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

এই সময় সে অস্থায়ী ভাবে জাহাজ ঘাটায় একজনের বদলী হিসাবে টালিক্লার্ক-এর কাজ করছিল। দৈনিক হিসাবে বেতনের ব্যবস্থা। শ্রমিকদের মতো দৈনিক বেতন। কন্‌ট্রাক্‌টরের মাধ্যমে সপ্তাহে-সপ্তাহে বেতন পাওয়া যায়। এই কাজে কদিন তার উপরি-উপরি নাইট ডিউটি পড়েছিল।

একদিন নাইট ডিউটি থেকে এসে সে সুলতাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। একটি আন্‌কোরা নতুন সেলাইয়ের হাত মেশিন নিয়ে কী সব জামাটামা সেলাই করছে একমনে বসে।

অমিয় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো,—এটা কার থেকে আনলি ?

সুলতা মুখ টিপে একটু হাসলো। অমিয় লক্ষ্য করলো, সুলতার মুখখানা আগের থেকে একটু ভরাট হয়েছে, কী একটা চাপা খুশী খুশী ভাব ওর মুখটিকে ঘিরে আরক্তিম আভা ফুটিয়ে তুলেছে।

সুলতা ধীরে ধীরে বললে,—কার কাছ থেকে আনবো। এটা আমার।

অমিয় আশ্চর্য হয়ে বললে,—তোর ! তোর মানে ?

সুলতা মুখ তুলে বললে,—তুমি একা সংসারের জন্য মুখে রক্ত তুলে খাটছো। আমিও তোমাকে একটু সাহায্য করতে চাই। অনেক জামা-টামা সেলাইয়ের অর্ডার পাওয়া গেছে, দেখ্‌ছো না !

অমিয় বললে,—তা অর্ডার-টর্ডার কি তুই নিজে ঘুরে ঘুরে গিয়ে জোগাড় করে আনছিস ?

সুলতা অল্প একটু হেসে বললো,—তা' কেন, লোক আছে।

—মা জানে ?

—জানে বই কী,—সুলতা বললে,—আমার ব্যাপার মা জানবে না ?

—আপত্তি করে নি ?

—না।

অমিয় বললে,—কিন্তু তুই মেশিন কোথা থেকে পেলি, বল্।

সুলতা বললে,—মাকে জিজ্ঞাসা করো না। মা বলবে'খন।

—তুই বল্ না ?

সুলতার সারা মুখে একটা সলজ্জ আভা ছড়িয়ে পড়লো, মুখ নীচু করে বললে,—কিনেছি।

অবাক হয়ে অমিয় বললে,—কিনেছি কী রে! ও যে অনেক টাকার ব্যাপার। টাকা পেলি কোথা থেকে ?

—ধার করেছি।

অমিয় বললে,—কে তোকে ধার দিলো, শুনি ? সত্যি কথা বলবি না আমাকে ?

সুলতা বললে,—মা ত' বড়দি-মেজদি দুজনকেই চিঠি লিখে লিখে হয়রান। তারা উত্তরও দেয়নি। মেজোজামাইবাবুর মনটা একটু ভালো, মা তাকেও চিঠি লিখেছিলো। কিন্তু তিনিও উত্তর দেননি, আসেনও নি। তাই, অগত্যা—

ও থামতেই অমিয় জিজ্ঞাসা করলো,—অগত্যা ?

সুলতা মুখ তুলে বললে,—মা চেষ্টা করলো, পারলো না; তুমি প্রাণপণে খাটছো, তবু আমাদের চলছে না—আমি তাই নিজেই চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার এক বন্ধু আছে—কিছুদূরেই তাদের

বাড়ী—রোজ দুপুরে তাদের কাছেই সেলাই শিখতে যেতুম। আগে ভাবতুম পড়াশুনা করে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিতে হবে যেমন করে হোক, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, তার থেকে সেলাই শেখা অনেক ভালো। এখন ভাবি, আরও আগে থাকতে কেন এ-কাজ আরম্ভ করি নি।

অমিয় ওর কাছে ধপ্ করে বসে পড়লো, নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, —সত্যি কথা বলবি, তোর এই বন্ধুটি কে? মেয়ে না পুরুষ?

সুলতার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—পুরুষ কেন হবে, মেয়ে। একসঙ্গে পড়তাম আমরা স্কুলে। ওর দিদিরা খুব ভালো সেলাই জানে। ওদেরই পরামর্শে আমি সব করেছি। ওরাই ষাট না পঁয়ষট্টি টাকা আমাকে ধার দিয়ে এই মেসিন আনিয়ে দিয়েছে। মাসে মাসে পনেরো টাকা কোম্পানীকে দিয়ে যেতে হবে। সব ওরাই করে দেবে। আমি ওদেরই বাড়ী থেকে কাপড় নিয়ে আসছি, ওরাই সব হিসেবপত্র রাখছে। সেলাই-টেলাই করে ওদেরই কাছে এই জামা-টামাগুলো পৌঁছে দেবার কথা। এইবার বুঝেছো ত ব্যাপারটা?

সত্যি কথা বলতে কী, অমিয়র মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বোনের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতাই যে তার মনে এই নিশ্চিন্ততা আনলো এমন নয়, বোন যে অভাবের দরুণ কোনো পিচ্ছিল পথে পা দেয়নি, এটা ভেবেই আশ্বস্ত হলো সে। মনটাও অনেক লঘু হয়ে গেল।

বোনের মাথায় সে হাতখানা রেখে বলে উঠলো,—তোর জয় হোক।

এই নিয়ে সুলতা তার সঙ্গে কৌতুক করবে, করবে কিছু হাসি-ঠাট্টা,—এইটাই সে ভেবেছিল। কিন্তু সুলতা তা করলো না,

হঠাৎ হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করে বসলো গম্ভীর ভাবে।

অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো অমিয় এই সময় থেকে। কী একটা অছিলা করে তাড়াতাড়ি উঠে গেল সে ওখান থেকে।

॥ ১৩ ॥

দিন কেটে যায়। বোধ হয় দিন পনেরো কেটে গেছে তারপর। বেশ মনে আছে, একটু অবসর পেয়ে অমিয় সেদিন আবার গিয়েছিল টালিগঞ্জে সুজাতা দত্তের খোঁজে। খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেই বাড়ীটা থেকে তার জিনিসপত্রগুলি পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে সে আসে নি এ-যাবৎ।

এ-দিন সেই প্রৌঢ় লোকটি বাড়ীতে ছিলো না, তার সাড়া পেয়ে সামনে এসেছিলেন সেই অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া মহিলাটি। মনে হয় একবার দেখেই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। সুজাতা সম্পর্কে তার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার পর মহিলাটি মৃদুকণ্ঠে তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—কী রকম আত্মীয় হন আপ্‌নি সুজাতার?

সে-কথার ঠিক উত্তর দিতে পারেনি অমিয়। জিজ্ঞাসা করেছিল —মেয়েটাকে কোন বোর্ডিং-এ রেখেছে জানেন?

—না।—মহিলাটি বলেছিলেন,—খুব চাপা মাইয়া, নিজের কথা কিছুই কইতে চায় না। আচ্ছা, আপ্‌নে কি ওর স্বামী হন নাকি? ডাইভোস্‌ করছেন ক্যান্‌ অমন ভালো মাইয়াডারে, অ্যাঁ?

পালাতে আর পথ পায়নি অমিয়। তাড়াতাড়ি ছুটে রাস্তায় এসে বাস ধরেছিল। বাসে তখন খুব ভীড় শুরু হয়ে গেছে,— অফিস-টাইম হবার আসন্ন তখন।

অমিয় সোজা বাড়ী এলো, চান-খাওয়া সেরে নানান জায়গায় ঘুরতে বেরুতে হবে।

চান করতে করতে বা ভাতের থালা সামনে নিয়েও সে ভেবে চলেছে সুজাতার কথা।

আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে, সে তার পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। বিচ্ছেদ-এর পর ফিরে-যাওয়া চলে না কি? না, আবার বিয়ে করতে হয়? কে জানে আইনের কী মারপ্যাঁচ। আরো একটা বিষয়ে তার নিশ্চিন্ততা এলো। যাক, সুজাতা নিশ্চয়ই ফিরে পেয়েছে তার ঘর। তার কথা আর চিন্তা না করলেও চলবে।

সেদিন সে যথারীতি জামা-টামা পরে বেরুচ্ছে, মা এসে বললে, —আজ একটু সকাল সকাল ফিরিস।

—কেন?

—দরকার আছে।

মনে মনে অমিয় বললে—দরকার আবার কীসের? দরকার ত টাকার। দেখা যাক।

কিন্তু সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে এসে সত্যি অবাক হয়ে গেল অমিয়। মা গেছে কাছেই কোন্ বাড়ীতে 'পাঠ' শুনতে ছোট ভাই-দুটিকে নিয়ে, ঘরে একা বসে লণ্ঠনের আলোয় সেলাই করছিল সুলতা।

—রাতেও সেলাই করছিস?

বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকেছিল অমিয়। আর তার পরেই শুরু হয়েছিল তার অবাক হবার পালা। নতুন একটা গোলাপী শাড়া পরেছে সুলতা, গায়ে ঘোর লাল ব্লাউজ, পায়ে আল্‌তা, হাতে সোনার চুড়ি চারগাছি করে, গলায় সোনার সরু হার, কানে সোনার রিং, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুরের রেখা টানা।

ওর কথা হঠাৎ-ই কানে যেতে সুলতা একটু চমকে উঠেছিল প্রথমটায়, পরে দাদাকে অমন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় মুখখানা মেশিনের ওপরে নত করে রেখেছিল কয়েক মুহূর্ত।

কিন্তু অমিয়র মুখে তখনো কথা নেই।

নিজেকে সামলে সুলতা উঠে দাঁড়ালো। আঁচলের খুঁট খুলে একটা পাঁচটাকার নোট ওর পায়ের কাছে রেখে মাথা হেঁট করে ওকে প্রণাম করলো সে।

তারপরে উঠে, বিছানার প্রান্ত থেকে একটা নতুন ধুতি নিয়ে এসে ওর হাতে তুলে দিলো। অতি কোমলকণ্ঠে বলে উঠলো,— একবার এটা পরো, দাদা।

তখনো অমিয়র মুখে কথা নেই দেখে ওর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকালো সুলতা, বললে,—এত দেরী করে এলে কেন?

অমিয় নতুন ধুতিটা হাতে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লো মেঝের ওপর। সামনেই তার লণ্ঠন, সুলতার সেলাইয়ের কল, আর অগোছালো করা একরাশ ছিটের কাপড়।

সুলতা সেই একরাশ কাপড়ের মধ্যে সেলাইকলের সামনে বসে পড়ামাত্রই অমিয় গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলে উঠলো,— রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ?

মুখখানা সেলাইকলের ওপরে নুয়ে পড়তে চায় সুলতার, কোনোক্রমে বললে,—হ্যাঁ।

—মা মেনে নিলো?

—হ্যাঁ।

—মা জানতো?

—হ্যাঁ।

—আগাগোড়া?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি কে?

—একটু পরেই আসবে।

—কবে থেকে হলো চেনাশুনো?

সুলতা দাঁতের প্রান্ত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা এক মুহূর্তের জন্য কামড়ে ধরলো, তারপরে মুখখানা সোজা উঠিয়ে বললে,—অনেকদিন!

—সে-ই বুঝি মেসিন-টেসিনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ!

—তাহলে সেই তোর বান্ধবীর বাড়ী-টাড়ী সব মিথ্যে?

স্পষ্ট, ধারালো গলায় সুলতা জবাব দিলো,—না। ওরা আমার এখন পিসতুতো ননদ।

—ওটাই তাহলে এখন তোর শ্বশুরবাড়ী?

—না, ঠিক তা নয়। ও থাকতো হোস্টেলে, মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতো।

অমিয় বললে,—বুঝলুম। কিন্তু এই সব অলঙ্কার? শাড়ী-টাড়ী?

—ওরা সবাই মিলে দিয়েছে।

অমিয় বললে,—যাক ভালোই হলো। চলে যাবি ত?

—না।

—না কী রে? শ্বশুরবাড়ী হবে না তোর? বাসা করবি না?

সুলতা বললে,—আসুক, সে-সব পরামর্শ করে ঠিক ক'রো তোমরা। আমার চুক্তিই হচ্ছে, মা-ভাইদের ছেড়ে আমি যাবো না।

—বলিস কী!—অমিয় বললে,—আর সে তা' মেনে নেবে?

—কেন নেবে না?—সুলতা বললে,—তার ঠিক নিজের বলতে কেউ নেই, মা নেই, বাপ নেই, মায়ের পেটের কোনো ভাইবোন পর্যন্ত নেই।

নিবিষ্ট চিত্তেই ওর কথা শুনছিল অমিয়। একটুক্ষণ নীরব

থাকবার পর অমিয়ই কথাটা তুললো,—হ্যাঁরে, নিজেদের জাতটাত ত ?

সুলতা মৃদু একটু হেসে বললে,—বামুন নয়।

অবাক হলো অমিয়, বললে,—সে কী !

সুলতা মৃদু হেসে বললে,—কায়েতও নয়—আরও নীচু জাত—পদবী 'হালদার' হলেও তোমরা যাকে বলো 'সিডিউল্ড্ কাস্ট্'—তাই। কী ? ঘেন্না হচ্ছে ত ?

অমিয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বোনের একখানা হাত টেনে নিলো, বললে, —ওঃ! তোকে যে কী ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে। শীগ্গির উঠে আয় মেসিনের কাছ থেকে।

বলে, ওর হাত ধরে সবলে আকর্ষণ করলো অমিয়। সুলতা 'আঃ ছাড়ো ছাড়ো পড়ে যাবো যে',—বলতে বলতে মেসিন ডিঙিয়ে ওর কাছ ঘেঁসে এসে বসলো।

অমিয় দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ওকে।

সুলতার মনে—ওর প্রশ্নর ধরণে যে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছিল, তা মুহূর্তে কেটে গেল।

কৃত্রিম রাগত ভঙ্গীতে বললে,—এখন খুব আদর হচ্ছে! আর আমি এদিকে ভাবনায় ভাবনায় মরছি। না জানি কী তুমি ভেবে বসবে—কী তুমি করে বসবে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর একখানা হাত কোলের ওপর রেখে তার ওপর নিজের হাতখানা বুলোতে বুলোতে বললে,—হ্যাঁ রে মাকে কী করে কন্‌ভিন্স করলি ?

সুলতা অল্প একটু হেসে বললে,—সব ব্যাপারটাই মা জানে। আপত্তি করবে কী। নেসেসিটি হ্যাজ নো ল। মা সব কিছু মনে মনে মানিয়ে নিয়েছে।

অমিয় ওর মাথায় হাতখানা রেখে বললে,—তুই সত্যি জয়ী

হয়েছিস। আর আমার কিছু বলবার নেই। হ্যাঁরে, মা কোথায় গেছে?

—যেখানে যায়। রামায়ণ শুনতে।

—ভাই দুটিকেও নিয়ে গেছে দেখছি।

সুলতা ফিক্ করে হেসে বললে,—ভাইবোনে যদি ঝগড়া বাধে। তাই যে যার গা ঢাকা দিয়েছে আগে থাকতেই। সে মানুষটিও ত ছিল বিকেল পর্যন্ত, তোমার আসবার সময় হতে না হতেই,—হাওয়া। কতক্ষণে ফিরে আসে দেখ।

ফিরে এলো অবশ্য আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। রোগা লম্বা চেহারা—মুখখানা মন্দ নয়—নাক চোখ সুন্দর—একটা বুদ্ধির ছাপ আছে—বেশ সপ্রতিভ ভাব,—কিন্তু গায়ের রং একেবারে মিশ কালো। নাম হলো—রতন।

রতন হালদার।

মিশুকে আছে লোকটি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বন্ধুত্ব জমে উঠলো। মা তখনো ফেরেনি। সুলতা ঘোমটা টেনে মেসিনের সামনে চুপচাপ বসে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অমিয় ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে লাগলো। বললো,—খুশী হলাম তোমার স্বাধীন ব্যবসা শুনে। অর্ডার সাপ্লায়ার্স না কী যেন বললে?

রতন বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোটখাটো ব্যাপার—চলে যায় একরকম।

অমিয় বললে,—ইচ্ছা করলে ত সরকারী চাকরী করতে পারতে। তোমাদের তো অনেক সুযোগ-সুবিধে। গ্রাজুয়েট যখন তুমি—। আমি অতদূর যেতে পারিনি, তাই চাকরী-বাকরীর সুবিধে করতে পারিনি।

রতন বললে,—সরকারী কাজে ঢুকেছিলুম—ভীষণ ক্লিক্—।

তাই বেরিয়ে এসে ব্যবসা করছি। আপনি যদি চাকরী-বাকরী করেন ত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার পার্টি ত বহু,—অনেক তা' বড়ো তা' বড়ো লোকের সঙ্গে জানাশুনো—।

সুলতা ওর কথার ধরণে হেসে ফেললেও লোকটি কিন্তু বাজে কথা বলেনি। মাস দুয়েকের মাথায় একটা চাকরী পেয়ে গেল অমিয়,—রতন হালদারের চেষ্টায়।

ততদিনে বস্তী ছেড়ে আশী টাকা ভাড়ায় শা-পুরে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছিল ওরা। দুখানা ঘর, বারান্দা, আলাদা স্নানের জায়গা ইত্যাদি।

একটিতে সুলতা-রতন, অপরটিতে মা আর তারা তিন ভাই।

সুলতার সেলাই থেকেও তখন কিছু কিছু আয় হতে শুরু করেছে।

এখন মোটামুটি চলে যাবার মতো যখন হয়েছে পরিবেশ—তখন আর একটু নিশ্চিন্ত হবার মতো ঘটনা ঘটলো—একেবারে আড়াই শ' টাকা মাইনের চাকরী পেয়ে গেল অমিয়। যদিও স্থায়ীত্বের দিক থেকে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

চাকরীটাও বিচিত্র। বিরাট বড়লোক তাঁরা—বাঙালী। হরেক রকম ব্যবসা আছে তাঁদের। তারই একটি হচ্ছে,—পুরো রেলট্রেন ভাড়া করে একদল তীর্থযাত্রী নিয়ে যেতে হবে হরিদ্বার হৃষিকেশ এবং কাহা কাহা মুলুক।

ঝামেলা যথেষ্ট। প্রথমদিকে ত চান-খাওয়ার সময় থাকতো না। ট্রেনের ব্যবস্থা করাই কি কম ঝঞ্ঝাটের? তারপরে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে—টিকিট বিক্রী করা আছে—যাত্রীদের নানাবিধ তদ্বিরের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ট্রেন যখন 'বদরী-বিশাল-কী জয়'—বলে হাওড়া থেকে ছাড়লো, তখন থেকে অদ্ভুত এক বৈচিত্র্য জীবনে অনুভব করতে লাগলো অমিয়। কাজ করতে কোনোদিন সে কুণ্ঠিত ছিল না, এবং এ ধরণের কাজে সে সত্যিকার আনন্দ পেলো।

াবলো,—পরের বছর যদি এ-কাজ টিকে থাকে ত তার মাকেও সে য়েয়ে আসবে তীর্থ করাতে।

॥ ১৪ ॥

দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই সবার সে প্রিয় এবং প্রয়ো-নীয় হয়ে উঠতে লাগলো। ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে সবাই াগে তার খোঁজ করে,—অমিয় কোথায় গেল? অমিয়কে ডাকো া?

ঘুরে ঘুরে যেদিন সে হরিদ্বার হয়ে সমস্ত দলটিকে নিয়ে হৃষিকেশ পৌঁছলো সেদিনই তার জীবনে ঘটলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দল নিয়ে সে যে একা এসেছে তা নয়, সঙ্গে আরও কর্মচারী আছে, চাকর-াকরও আছে। দল নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নয়। সে তাকিয়ে দখলো,—আরও একদল তীর্থযাত্রী এসেছে অনুরূপ কোনো এক াইভেট কোম্পানীর তদারকে। তাদের সঙ্গে এদের স্বভাবতই েকটা মানসিক প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো প্রতি বিষয়ে। খাওয়া াওয়া ঘোরাফেরা সব নিয়েই যাত্রী বা যাত্রিনীরা তুলনা দিতে াগলো প্রতি কথায়। ওদের বাসটা কতো বড়ো, আমাদের ছোট –ওদের খাওয়া-দাওয়া কতো পরিষ্কার ইত্যাদি। অভিযোগ নতে শুনতে অমিয় পাগল হবার জোগাড়। দুটি দলই তখন ষিকেশে কালী কম্বলীওয়ালার ধর্মশালায় আস্তানা নিয়েছে। দুটি াঙালী দলেই ভরে গেছে ধর্মশালার পুরো দোতলাটা। নীচের তলার কিছু অংশও দখল করতে হয়েছে। ক্রমাগত নালিশ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ওদের অফিস-এ গিয়ে হানা দিলো

অমিয়। একটি ঘরের সামনে লাল সালু টাঙিয়া দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে লেখা রয়েছে শাদা অক্ষরে,—অফিস।

ঢুকেই দেখে একটি মহিলা বসে কী সব হিসাব-টিসাব করছেন; নীচে দুটি লোক বসে, চাকর-বাকরই হবে হয়ত।

—আপনাদের ম্যানেজার মশাই কোথায়?

ওর প্রশ্ন শুনে মহিলাটি মুখ তুলে তাকালেন। ধবধবে ফরসা—শাদা সরু পাড় একটা ধুতি পরনে, হাতে একগাছি করে সরু চুড়ি, গলায় এক চিলতে হার, কানে ছোট্ট দুটি পাথরের ফুল, মাথার চুল কিছু রুক্ষ, আল্‌গা ফাঁস করে খোঁপা বাঁধা, সিঁথি শূন্য।

মহিলাটি গম্ভীর ভাবে বললেন,—ম্যানেজার বাসস্ট্যাণ্ডে গেছেন। কী দরকার?

অমিয় কী বলবে ঠিক করতে না পেরে এক মুহূর্তের জন্য বুঝি নীরব হয়ে গেল। মহিলাটি ইঙ্গিতে মেঝের ওপরে বসে-থাকা লোক দুটিকে উঠে যেতে বললেন। তারা চলে যেতেই ওকে হাত দেখিয়ে তক্তপোষের প্রান্তে বসতে অনুরোধ করলেন তিনি।

অমিয় জড়োসড়ো হয়ে টান করে পাতা শাদা চাদরটার ওপরে বসলো। ভদ্রমহিলা একটা হাতবাক্সের ওপরে খেরোখাতা রেখে কী সব লিখছিলেন। সেই অবস্থায়, হাতে কলম, কনুইটা বাক্সের ওপরে রেখে হাতখানা চিবুকে ঠেকিয়ে ওর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—আমিও কর্মচারী। মেয়ে যাত্রীদের দেখাশুনা করি আবার অবসর সময়ে হিসেবও লিখি। বলুন, কী বলবেন?

অমিয় কী যেন বলতে গিয়েও ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

মহিলাটি একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন—গত দু'দিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম আপনাকে। নাম বুঝি—অমিয়?

—কী করে বুঝলেন?

—সবাই ডাকছিল কিনা, তাই।

অমিয় সোজা হয়ে বসলো, বললে,—আপনাকে এ দুদিন অবশ্য লক্ষ্য করতে পারিনি, কিন্তু এখন আর ভুল হবার জো নেই। আপনার নাম আমি জানি। সুজাতা দত্ত।

মেয়েটি চমকে উঠলো। মুখখানা আরক্ত হলো। তারপরে সে ভাবটা সামলে নিয়ে সে বললে,—কী করে জানলেন?

অমিয় বললে,—দৈব খানিকটা আমাকে সাহায্য করেছে। নইলে, সলোমন পর্যন্ত যার ঠিকানা জানতো না, তার ঠিকানা সামান্য মোজা-বিক্রেতা জানলো কী করে।

—তাই নাকি!

অমিয় বললে,—অবাক হবারই কথা। লোকটা ইনফর্মার ছিল, আপনাকে গোপনে ফলো করে আপনার ঠিকানা জেনে এসেছিল। এমন কি, আপনার আসল নামটাও জেনেছিল।

মেয়েটি বললে,—যাক্। আর কিছু বলবেন?

অমিয় বললে,—না।

—কী বলতে এসেছিলেন?

—কিছুই না।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো অমিয়। তারপরে হঠাৎ একসময় ফিরে দাঁড়ালো, বললে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? এ-বেশ কেন? সিঁথিতেও—

মেয়েটি বললে,—বিধবা না হলেও বিধবা সাজতে হয়েছে চাকরীর খাতিরে।

বলেই একটু হাসলো সে, বললে,—ডাইভোর্স করার পর কী হবে স্ত্রীদের সংজ্ঞা? সধবা, না বিধবা, না কুমারী? ছেলেপুলে থাকলে কুমারী বলাটা চক্ষু লজ্জায় বাঁধে। আইনত সধবাও বলা যায় না, সুতরাং বিধবা বলাই শ্রেয়।

অমিয় অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো,—স্বামীর কাছে ফিরে যাওনি ?

মেয়েটি বললে,—না।

অমিয় ওর দিকে এগিয়ে গেলো, বললে,—সেই টালিগঞ্জের বাড়ী থেকে—

বাধা দিয়ে সুজাতা বললে,—টালিগঞ্জের বাড়ীতেও হানা দেওয়া হয়েছিল নাকি ?

—নিশ্চয়।

সুজাতা বললে,—তাহলে ত অনেক কিছুই জেনেছো।

অমিয় ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে,—সেই চতুর্থ দিনটির কথা মনে আছে ?

চোখ ছুটি জলে ভরে উঠলো মেয়েটির, চোখ নামিয়ে বললে,—কখনো ভুলবো !

—এলে না কেন সে-দিন ?

সুজাতা ওর চোখের দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালো, বললে,—ছিলে বুঝি অপেক্ষা করে ?

—নিশ্চয়ই।

সুজাতা মুখখানা রাখলো হাতবাক্সটার ওপরে, কান্নাভরা কণ্ঠে বললে,—পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না।

তারপরেই মুখ উঠিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে,—তুমি যাও—কেউ এসে পড়বে—পরে কথা বলবো।

—কখন ?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুজাতা বললে,—কখন জানি না—আমিই তোমাকে খুঁজে নেবো। লক্ষ্মীটি যাও—। এখানে একটুতেই ভীষণ বদ্‌নাম হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অমিয়।

এবং সেই যে বেরিয়ে এলো, আর দেখা হলো সুজাতার সঙ্গে দেড়মাস পরে।

পরদিন সুজাতাদের দল যাত্রা করে বেরিয়ে গেল বদরিকাশ্রম।

অমিয়দের দলের রওনা হতে দেরী হয়ে গেল আরও ছ'দিন।

বাস পাওয়া চাই ত? একখানা-আধখানা হয়, পাঁচ-পাঁচখানা বাস।

অবশ্য সব যাত্রীই বদরিকাশ্রম যায় না। যারা বদরিকাশ্রম যাবে, তাদের খবরদারীর ভার পড়লো অমিয়র ওপরে। অন্যদের নিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা করলো ম্যানেজার। সে-সব নিয়ে তার মাথা ঘামাবারও কিছু ছিল না।

কিন্তু পথের বর্ণনা কিম্বা যাত্রীদের নিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এ-কাহিনীর বিষয়-বস্তু নয়। সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হতো অমিয়কে। একদিকে অবুঝ যাত্রীদল, অন্যদিকে পাণ্ডাঠাকুর, আর একদিকে বাসওয়ালা। এই ত্রিমুখী অভিযানকে সামলে বেড়িয়ে তবেই তার বিশ্রামের প্রসঙ্গ।

রাত্রে ছ' ঘণ্টাও ঘুমুতে সে পায় কিনা সন্দেহ। অন্য কর্মচারী আছে, ক্যাশিয়ার ইত্যাদি। কিন্তু তাদের কেউ চায় না, সবাই খুঁজবে অমিয়কে। এমন কি, পাণ্ডা থেকে আরম্ভ করে বাসওয়ালা পর্যন্ত।

এর মধ্যে সুজাতার কথা ভাববে, এমন মুহূর্তটুকুও সে পাবে কখন?

তার ওপর পথযাত্রার ক্লেশ আছে। বাস শেষ করে তারপরে হাঁটাপথ। এর মধ্যেও আবার দল-বিভাগ আছে। একটি দল যাবে কেদার হয়ে বদরিকাশ্রম, এরা দলে ছোট।

বলা বাহুল্য, বড় দলটি যাবে মাত্র বদরিকাশ্রম। চামৌলীর পথে বড়দলটিকে রওনা করে দিয়ে সে নিজে ছোট দলটিকে নিয়ে ছুটলো কেদারনাথ।

সব যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখেছে, নিজের কর্তব্যকর্ম করে গেছে, কিন্তু মনে মনে খুঁজেছে একটি মানুষকে, যার দেখা সারা কেদারের পথে সে পেলো না।

এমন কি, কেদার থেকে চামোলীতে ফিরে এসে আবার বদরিকাশ্রমের দিকে যখন রওনা হলো তারা, তখনো দেখা পাওয়া গেল না সেই মানুষটির। যখনই তারা কোথাও পৌঁছেছে, তখনই খোঁজ নিয়েছে সে, তাদের আগে কোনো বাঙালী যাত্রীর দল গেছে কিনা।

কখনো কখনো খোঁজ পেয়েছে, তিনদিন আগে একটি বৃহৎ বাঙালী যাত্রীদল চটি থেকে এগিয়ে গেছে।

অমিয় আশা করেছিল, চামোলীতে অন্তত দেখা পাওয়া যাবে। মনে মনে সে ভাবত—হয়ত আমরা যাচ্ছি, ওরা ফিরছে। 'বদরী-বিশাল কী জয়!'—সেই সরু পাড় ধুতিপরা, মাথায় রুক্ষ চুল,—হঠাৎই কোনো চড়াইয়ের পথে হয়ত মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

অমিয় জিজ্ঞাসা করবে,—বেশ মানুষ তুমি! খুব ত খুঁজে বার করলে!

সুজাতা হয়ত উত্তর দেবে,—চুপ চুপ, কথা কয়ো না লক্ষ্মীটি—এখানে বড্ড বদ্‌নামের ভয়!

কিন্তু হলো না দেখা। সমস্ত দল নিয়ে সে ফিরেছে। কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, লছমনঝুলা, হৃষিকেশ বাসস্ট্যাণ্ড,—কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না।

॥ ১৫ ॥

দেখা পাওয়া গেল হরিদ্বারে। হরিদ্বারে যাত্রীদের ঝামেলা মেটাতেই প্রথমদিনটা কেটে গেল। দ্বিতীয়দিন ভোরবেলা 'হর-

কি-পৈড়ী'তে স্নান করে উঠে আসছে অমিয়, হঠাৎ-ই পিছন থেকে মৃদু একটা কণ্ঠস্বর,—এই।

চমকে পিছনে তাকাতেই তাকে দেখতে পেলো অমিয়। সে-ও স্নান সেরে আরেকখানা ধবধবে ধুতি পরে, মাথার ভিজে চুল বৈষ্ণবীদের মতো ক'রে মাথার ওপরে চুড়ো করে রাখা।

শরীর পথযাত্রার শ্রমে বিশীর্ণ হলেও মুখখানা আরও ফরসা, আরও লালিত্যময় মনে হচ্ছে।

তাকে নির্বাক হয়ে অমন করে তাকাতে দেখে সুজাতা বললে,—তোমাদের হোটেল ত হর-কি-পৈড়ীর একেবারে ওপর,—আমি জানি,—এসেই খোঁজ নিয়েছি,—শিগ্‌গির হোটেলে ভিজে কাপড়-টাপড় রেখে এসো। আমি মায়াপুর ব্রীজের কাছে আছি। তুমি চলে এসো।

বলে, আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে সামনের অগণন বিপণি-বুকে-নিয়ে-দাঁড়ানো সরু গলিটার মধ্যে মিলিয়ে গেল—মিশে গেল জনতার মধ্যে।

অমিয়র কয়েকটা মুহূর্ত গেল বিস্ময়ের ঘোর কাটতে। সামনের বিরাট চারতলা হোটেলটিই তাদের জন্য নির্দিষ্ট। এখান থেকেই দেখা যায়, তিনতলার একটা বারান্দার রেলিং-এ ঝুলছে তাদের কোম্পানীর নামলেখা লাল সালু।

অমিয় আর দাঁড়ালো না, দ্রুতপায়ে উঠে গেল হোটেলের সদর দরজা পেরিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে একেবারে তেতলায়,—তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে। চারজন কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট এই ঘর। পুরো তিনতলা আর চারতলা জুড়ে তাদের যাত্রীরা রয়েছে। বুড়ো-বুড়ীরা প্রায় সবাই উঠে গেছে,—হোটেলের বয়রা গরম পুরী চা জিলিপী প্রভৃতির অর্ডার নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

যাচ্ছে, আর ফিরে আসছে অতিকায় কেট্‌লী আর শালপাতার বৃহৎ ঠোঙা নিয়ে।

অমিয় চট্‌ করে বেশ পরিবর্তন করে নিলো, তার টাকার ব্যাগটাকে পকেটে ফেললো,—এবং 'কোথায় অমিয় ?' 'অমিয়দা, শুনুন ?'—এইসব কলরব ওঠবার আগেই দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এলো।

পথের ওপর আর দাঁড়ালো না, হর-কি-পৈড়ীকে বাঁয়ে রেখে সে গঙ্গার বাঁধানো তীরভূমিতে পা ফেললো। ঘণ্টার শব্দ, স্তোত্র-পাঠের সুর, ধর্মার্থী-ধর্মার্থিনীদের ভীড়,—সব পেরিয়ে হাঁটতে লাগলো মায়াপুরের সেতুর দিকে।

একটি অতিকায় 'ছত্র'-এর নীচে মাথায় একটু ঘোমটা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসেছিল সুজাতা। ও কাছাকাছি আসতেই উঠে দাঁড়ালো। বললে,—কিছু খেয়ে নেবে ত ?

অমিয় কিছু বলবার আগেই ওকে নিয়ে সামনাসামনি একটা গলির মধ্যে ঢুকে মূল গলি-পথটিতে পড়লো গিয়ে সুজাতা। ঘোমটা সে খোলে নি, একটি অপেক্ষাকৃত কম ভীড়ের দোকানে গিয়ে উঠলো ওকে নিয়ে। চা জলখাবার খেতে খেতে অমিয় জিজ্ঞাসা করলো,—তোমাদের আস্তানাটা কোথায় ?

ফিস্‌ফিসিয়ে উত্তর দিলো সুজাতা,—আমাদের আস্তানা মানে ? আমাদের দল ত চলে গেছে গতকাল !

—তুমি !

সুজাতা বললে,—এতক্ষণে ট্রেনের মধ্যে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে অমিয় বললে,—তারপর ?

সুজাতা হেসে বললে,—চাকরীটা যাবে আর কী।

—এরকম করলে কেন ?

সুজাতা মৃদু তিরস্কারের সুরে বললে,—খেয়ে নাও দেখি তাড়াতাড়ি।

অমিয় বললে,—তুমি আছো কোথায়?

—ভোলাগিরির আশ্রমে।

—একা?

সুজাতা বললে,—অত বকতে পারি না। ওঠো। যেতে যেতে সব বলছি।

বলে, ওকে নিয়ে কোনো একটা অতি সরু গলি দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে বড়ো রাস্তায় পড়লো। একটা টাঙা ভাড়া করলো, বললে,—চলো কনংখল।

—সে কি! এখন আবার কনংখল কেন?

সুজাতা বললে,—তবে কি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করবো। টাঙায় বসে কথা বলার সুবিধে হবে এটা বুঝলে না?

অমিয় চুপ করে রইলো। সুজাতা বললে,—আমার সেই কথাটা তোমার মনে আছে? নো ইতিহাস প্লিজ!

—মনে আছে বৈকি! সবই মনে আছে।

সুজাতা বললে,—এখনো সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করছে।

—বেশ ত।

সুজাতা বললে,—না শুনে তুমি ছাড়বে বুঝি?

অমিয়র কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এলো, বললে,—বিশ্বাস করো, এখানে এসে, আর সত্যিই ও-সব তুচ্ছ কথায় মন দিতে ইচ্ছে করে না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, মেয়েটাকে কোথায় রেখে এসেছো?

—ওটাই ত একমাত্র বন্ধন,—সুজাতা বললে,—সেই বোর্ডিং-এই আছে। মাসে মাসে ঠিক মত টাকা পাঠাতে পারলেই অমি নিশ্চিন্ত।

অমিয় বললে,—এ চাকরী গেলে টাকা পাঠাবার কী হবে?

বলতে গিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠলো সুজাতা,—কী জানি। ভাবতে পারছি না।

অমিয় বললে,—হঠাৎ এটা করলে কেন?

—কি করলাম!

—এই যে দল থেকে পালালে।

অল্প একটু হেসে সুজাতা বললে,—কি জানি! পাতালের আমি আর স্বর্গের আমি বোধ হয় এক নই। আমার আর ফিরে যেতেই ইচ্ছে করলো না।

অমিয় বললে,—চলবে কী করে তোমার?

সুজাতা বললো,—প্রায় ছশো টাকা পুঁজি হয়েছে আমার। তা জানো!

অমিয় চোখ বিস্ফারিত করে বললে,—বটে!

—হ্যাঁ। মেয়েকে মাসে মাসে পাঠিয়েও। এ-মাসের পয়লা তারিখেও পাঠিয়েছি।

অমিয় বললে,—তবে ত তুমি ক্যাপিটালিস্ট্। আমার কাছে কুড়িয়ে কাচিয়ে বড় জোর তিনশো হবে।

আবার চোখ দুটি বিস্ফারিত হলো সুজাতার, বললে,—ওরে বাবা! তবে ত অনেক টাকা! ছশো আর তিনশো, ন'শো টাকা! আর আমাদের পায় কে!

—মানে!

সুজাতা বললে,—একটা সাধ আমার মেটাবে? জীবনের একটি মাত্র সাধ।

—কী?

সুজাতা বললে,—যাত্রীদের তাড়া খাইয়ে স্বর্গ ঘুরে এলাম, কিন্তু

নিজে ঠিক স্বর্গ দেখতে পেলাম না। যাবে আমার সঙ্গে কেদার-বদ্রী ?

সবিস্ময়ে বলে উঠলো অমিয়,—বলছো কী তুমি।

সুজাতার দুটি চোখ বড়ো করুণ দেখালো, কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো নিদারুণ মিনতি। বললে,—তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল নরকে। আমার ওপর তোমার প্রেম—এ আমি আশা করি না। দুর্গম পথ, আমি দিশাহারা না হয়ে যাই,—সেই জন্য একজন সঙ্গী চাইছি।

অমিয় চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবলো। টাঙা ততক্ষণে কনখল পৌঁছে গেছে। টাঙাওয়ালা 'উৎরাইয়ে' বলামাত্র ওদের বুঝি হুঁশ হলো। কিন্তু সুজাতা নামলো না, ওকেও নামতে দিলো না, টাঙাওয়ালাকে বললে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার হরিদ্বার ফিরে যেতে।

টাঙাওয়ালা অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরে টাঙায় উঠে বসে বিড়বিড় করতে করতে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালো।

ধীরে ধীরে কথা বললো অমিয়। বললে,—সঙ্গী তুমি আরও অনেক পেতে পারতে।

সুজাতার মুখখানা ম্লান দেখালো। বললে,—হ্যাঁ, নরকে সঙ্গীর অভাব কী ? তবে স্বর্গে—

অমিয় বলে উঠলো,—আমার দেখা যে এ-ভাবে পাবে, তুমি আশা করেছিলে ? আমি হরিদ্বারে এই-দেখা-হয়ে-যাওয়ার কথা বলছি না, আমি বলছি, সেই হৃষিকেশে প্রথম দেখা হয়ে যাওয়ার কথাটা! যদি দেখা না হতো—?

সুজাতা বিরস কণ্ঠে বললে,—কী জানি! হয়ত এ-সাধ মনে জাগতো না। হয়ত চাকরী চলে যাবার ঝুঁকিও নিতাম না।

অমিয় বললে,—তোমার সাধ মেটাতে আমারও চাকরী চলে যাবার ঝুঁকি নিতে হবে, তা জানো?

সুজাতা বিবর্ণ মুখে ওর দিকে তাকালো! অমিয় বললে,—অবশ্য সংসারের দায়িত্ব আর অতোটা আমার নেই। চাকরী গেলেও খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই। তবে, আমার ভগ্নীপতির দেওয়া এই চাকরী, সে হয়ত কিছুটা তিরস্কৃত হবে।

সুজাতা খপ্ করে ওর্ হাতটা ধরলো, বললে,—আমার দাবি নেই, তবু বল্ছি—। আচ্ছা, ওদের যদি সব খুলে বলো? দুই কি তিন সপ্তাহের ছুটি দেবে না?

অমিয় বললে,—তোমার সম্বন্ধেও ত সেই কথা। তুমি ছুটি না নিয়ে পালালে কেন?

মুখ নীচু করলো সুজাতা, বললো,—বুঝেছি।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটলো। অমিয় বললে,—আচ্ছা ধরো—আমি যদি তোমার কথায় রাজী হতাম, তুমি তখন কী করতে?

সুজাতা বললে,—আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করতাম না—পোঁট্‌লা-পুঁটলী নিয়ে ছুটে যেতাম হৃষিকেশ—বাসে দুটো সিট কি পেতাম না? একদৌড়ে একেবারে যতদূর যাওয়া যায়।

অমিয় বললে,—তবে চলো। আর কোন দ্বিধার প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্য দুটি মানুষ ওরা। অমিয় শুধু ক্যাশিয়ারের হাতে একখানা চিঠি লিখে দিলো মালিকের নামে। লিখলো,—তিন সপ্তাহের জন্য কেদার-বদ্‌রী চললুম। সবাইকে দেখাতে গিয়ে নিজে দেখতে পাইনি দেবতাকে। হয়ত এর জন্য ইস্তফাপত্র দেওয়া প্রয়োজন, এটিকেই ইস্তফাপত্র মনে করলে বাধিত হবো।

ক্যাশিয়ার জিজ্ঞাসা করলো,—কী হলো মশাই? চিঠি কিসের?

অমিয় তার স্যুটকেশ-বেডিং কুলির মাথায় চাপাতে চাপাতে বললে,—আমি চলে যাচ্ছি।

—মানে।

—চাকরী ছাড়লুম বলতে পারেন।

কেদার-বদরীতে তখনো যাত্রী যাওয়ার বিরাম নেই। বাসে কিম্বা পথে তখনো বেশ ভীড়। পুরো একটা দিন ওদের থাকতে হলো হৃষিকেশ—সেই কালী কম্বলীওয়ালার ধর্মশালায়। ম্যানেজার পরিচিত হয়ে গিয়েছিল ওদের দুজনের কাছে। বললে,—কী ব্যাপার! আপনারা?

—ঘর চাই—দুখানা অবশ্য।

ম্যানেজার বললে,—একখানাও ঘর নেই। বড়ো ঘরটায় যাত্রীদের মধ্যে থাকতে পারেন।

রাজস্থানী স্ত্রীপুরুষের একটি বিরাট দল স্থান নিয়েছে হল্‌ঘরটায়, তারই একপাশে ওরা গিয়ে বিছানা পাত্‌লো। পাশাপাশি নয়, মুখোমুখি। নইলে স্থান সংকুলান হয় না।

ঘটনাচক্রে সুজাতার পাশাপাশি বিছানা পেতেছিল একটি বর্ষিয়সী মহিলা। আর অমিয়র পাশে প্রায় ওরই বয়সী একটি তরুণ।

এরা গ্রামের মানুষ, ক্ষেত খামার নিয়ে ওদের দিন কাটে, ওদের মনোবৃত্তি ভিন্ন। নইলে, এতক্ষণে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে ওদের দুজনকে বার বার দেখতো। সুজাতা বিছানায় এসে বসলো। অমিয়ও বসলো ওর মুখোমুখি।

ওর পাশের মহিলাটি সুজাতাকে ফিস ফিস ক'রে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে, সুজাতা একটু হেসে অনুচ্চ কণ্ঠেই তার উত্তর দিলো। সুজাতার ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসির রেখা। মহিলাটি কিন্তু হাসি-হাসি মুখেই ওর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকালেন।

ঘরের অন্য কোণে রীতিমত কলরব হচ্ছিল। যতদূর বোঝা যায়, টাকা-পয়সার কোনো হিসাব নিয়েই বিরোধ বেধে থাকবে।

অমিয় সুজাতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—কী বল্‌ছে, মহিলা?

সুজাতা উত্তর দিলো,-কী আবার! মেয়েরা যা জিজ্ঞাসা করে।

—ভাষা বুঝতে পারলে?

—বাজে ব'কো না। এত ঘুরে এলাম, হিন্দী বুঝবো না?

অমিয় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে,—তুমি কী উত্তর দিলে ওর প্রশ্নের?

সুজাতা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলে উঠলো,-কা মনে হয়?

অমিয় বললে,-যা মনে হয়, সে-কথা উচ্চারণ না করাই ভালো।

—তবে তা' অনুচ্চারিতই থাক।

অমিয় বললে,-তুমি কি এই দিনের বেলা শুয়ে-টুয়ে থাকবে নাকি?

সুজাতা বললো,-কথাটা মন্দ নয়। জায়গা দখল ত করা হলো, এখন বেরিয়ে পড়ি।

—তারপর?

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে মহিলাটিকে কী যেন বললো। মহিলাটি মাথা কাত্‌ ক'রে ওর প্রস্তাবে বোধ হয় সায়-ই দিলেন।

সুজাতা উঠে দাঁড়ালো, বললো,-চলো। আমাদের জিনিষপত্র ইনি দেখবেন!

চলো।

ওরা বেরিয়ে পড়লো। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে গঙ্গার ধার। ঘাটের কাছে বিশাল একটি গাছ। কিন্তু ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওরা গঙ্গার ধারার নাগাল পেলো না, গঙ্গা ঘাট ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

পাশাপাশি হেঁটে ওরা জলের ধারে এলো। ছোট ছোট খুপরী

করা হয়েছে। সেখানে পাণ্ডাঠাকুররা আছেন। যাত্রীরা স্নান-টান করছে ঐ সব ঘরে ঢুকে কাপড়-টাপড় বদ্‌লাচ্ছে।

সুজাতা বললে,-কী ভীষণ স্রোত দেখেছো!

—স্নান করবে নাকি?

—ওরে বাবা-ভয় করে।

—ঘটি চেয়ে নিয়ে জল তুলে মাথায় দাও। করবো সে-ব্যবস্থা?

সুজাতা ওর দিকে অপাঙ্গে তীর্যক চোখে তাকিয়ে বললে,-থাক বাপু—অত পুণ্যে দরকার নেই। তোমার ইচ্ছা থাকে ত, সেরে নিতে পারো।

অমিয় বললো,-তাহলে অনুমতি দাও।

সুজাতা হাসিমুখে মাথা হেলিয়ে এর উত্তর দিলো নীরবে।

অমিয় আর দেরী করলো না, পাণ্ডাঠাকুরের কাছ থেকে গামছা গামছা চেয়ে নিয়ে একেবারে নেমে পড়লো জলে।

সুজাতা ভয় পেয়ে বলে উঠলো, -করছো কী, তুমি?

—ভয় নেই, ডুববো না।

সুজাতা তবু সভয়ে দেখতে লাগলো, প্রবল স্রোতবেগকে উপেক্ষা ক'রে অমিয় জলের নীচে সুদৃঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। একটি ডুবও দিলো। তারপরে কপাল ঢেকে দেওয়া ভিজে চুলগুলো সরাতে সরাতে বললে,—দেখে যাও কাণ্ড! ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে ঠোক্‌রাবার চেষ্টা করছে। রীতিমত বড়ো মাছ।

এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে সত্যিই মাছগুলোকে দেখতে পেল সুজাতা। লম্বা লম্বা কালো কালো মাছ—!

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো সুজাতা, বললে,—শীগ্‌গির উঠে এসো।

অমিয় সে-কথায় কান না দিয়ে আরেকবার ডুব দিলো। তারপর আরও একটি ডুব।

—কী ঠাণ্ডা জল।

সুজাতা বললো,—তা হোক—তুমি উঠে এসো।

অমিয় আর দ্বিরুক্তি করলো না, সত্যিই উঠে এলো, চলে গেল পাণ্ডাঠাকুরের ছাউনীর ভিতরে। কাপড়-চোপড় প'রে পাণ্ডা-ঠাকুরের সামনে 'প্রণামী' রেখে, অমিয় বেরিয়ে এলো সুজাতার কাছে। আর বেশী দেরী করলো না ওরা। সুজাতাকে ধর্মশালার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে অমিয় গেল বাসষ্ট্যাণ্ডে আসন সংরক্ষণের শেষতম ব্যবস্থা করার উদ্দেশে।

সারা দিনটা বলতে গেলে ওদের কাটলো ছুটোছুটি ক'রে। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ ক'রে ওরা এসে বসলো যে-যার বিছানায়। অমিয় তাকিয়ে দেখলো, তার পাশের ছেলেটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে গায়ের ওপর চাদর টেনে। আর, সুজাতার পাশের বিছানার ভদ্রমহিলা তাঁর ওপাশের ভদ্রমহিলার সঙ্গে মৃদু-মৃদু—ফিস্‌ফিস্ বাক্যালাপে ব্যস্ত।

অমিয় বললে,—দুপুরে ফিরে এসে চান করেছিলে ত?

সুজাতার মুখখানা আবার বিষণ্ণতায় ভ'রে গিয়েছিল। সে চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো, বললে—চান ত আমার হরিদ্বারেই সারা হয়ে গিয়েছিল, এখানে আরেকবার গা ধুয়ে নিলুম।

অমিয় নেহাৎ কথা বলার জন্যই প্রসঙ্গটা তুলেছিল, নইলে এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

আর কোনো কথা নেই।

রাত আরও বাড়তে লাগলো। রাজস্থানী পুরো দলটা ঘুমিয়ে পড়বার পর ওরাও শুয়ে পড়লো। ওদের অপর পাশে দেওয়াল, কাছেই লণ্ঠনটা স্তিমিত শিখায় জ্বলছে।

ধর্মশালায় বিদ্যুৎ আছে, কিন্তু হল ঘরটার লাইন খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুণ এই ভাবে লণ্ঠন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ওরা দুজনেও শুয়ে পড়েছিল। শরীর ক্লান্ত অথচ পোড়া চোখে ঘুম নেই, নানান্ চিন্তা এসে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঝংকৃত হয়ে উঠতে লাগলো।

—ঘুমুলে ?

—না।

এরপর দেখা গেল, পরস্পরের মুখোমুখি শুয়ে ওরা ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছে।

অমিয় বললো,—আমার সব কথা ত বললাম, তোমার কথা কিন্তু শোনা হলো না।

সুজাতার উত্তর,—আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি ?

অমিয় বললে,—তবু, শুনি ?

সুজাতা একমুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললো,—ঘোরা শেষ ক'রে যখন হরিদ্বারে ফিরে আসবো, তখন শুনো, কেমন ? তখন ত যে-যার পথে চলে যাবো, ছাড়াছাড়ি হবার আগে কী পাথেয় নিয়ে যাবে ? আমার কথাগুলোই নিয়ে যেও।

অমিয় চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। একটা পোকা কোথা থেকে এসে হারিকেনটার চার পাশে ঘুরছে। ফর্‌ফর্-ফর্‌ফর্— অস্বস্তিকর শব্দ।

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে পোকাটাকে কিছুক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করলো, তারপরে অমিয়কে বললো,—কী হলো ? ঘুমিয়ে পড়ছো না কেন ?

—ঘুম না এলে কী করবো ?

—এত ঘোরাঘুরির পরও ঘুম আসছে না ?

—তোমার আসছে ?

এবার নিরুত্তর রইল সুজাতা।

অমিয় জিজ্ঞাসা করলো,—সত্যি, ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, চাকরীটা পেলে কী করে ?

সুজাতা বললে,—যে ক'রে লোকে পায়। অ্যাপ্লিকেশন করে।

—না। অতো সহজ নয়।

সুজাতা মুখ টিপে একটু হাসলো, বললো,—অর্থাৎ এখুনি সব কথা না শুনে তোমার ঘুম হচ্ছে না, এই ত?

অমিয় গম্ভীর ভাবে বললো,—কথাটা মিথ্যে নয়।

সুজাতা কনুয়ের ওপর ভর রেখে মাথাটা উঁচু করলো, তারপরে ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলো,—টালিগঞ্জের বাসার দরজায় তালাবন্ধ করে দিলো বাড়ীওয়ালা, আমি সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমার সেই বান্ধবীর কাছে যাই, যে আমাকে সলোমন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার কাছে ক'দিন থাকা যায়? তার ওপর মেয়ের হোষ্টেলে টাকা পাঠানো আছে না? আমার তখনকার অবস্থা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার বান্ধবীটি সব বুঝলে, সব জানলো। জেনে তোমার সেই 'চতুর্থ দিনে' আমাকে সলোমন-সাহেবের কাছে প্রাণপণে পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমিও যাবো না, সে-ও আমাকে পাঠাবে। শেষ পর্যন্ত দুরন্ত এক জেদ তার মনে চেপে বসলো। যখন কিছুতেই আমাকে পাঠাতে পারলো না, তখন বললে— আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও, এখ্‌খুনি।

কিছু বলার নেই। এক-কাপড়ে ঠিক সেই ভাবেই তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। ব্যাগে আমার তখন সম্বল মাত্র ছ'টাকা বারো আনা। ভাবতে পারো আমার অবস্থা?

অমিয় রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,—তারপর?

—'তারপর আর কী,—সুজাতা বললে,—তখন বেশ রাত্তির হয়ে গেছে। কোথায় যাই? 'বাস'-এর পয়সা খরচ করে গেলাম শেয়ালদা ষ্টেশন। কাউকে চিনি না। অথচ, কাঁহাতক চুপচাপ বসে থাকা যায়? গুটিগুটি হেঁটে এসে উদ্বাস্তুদের এক ঝুপড়ীর

কাছে দাড়িয়েছি, হঠাৎ কী মনে ক'রে আমারই বয়সী একটি বউ এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো,—দিদিমণি কি কারুর জন্য অপেক্ষা করেন নাকি ?

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। সে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করতেই, বলে উঠলাম,—না ভাই, আমি একটু বিপদে পড়েছি লাষ্ট ট্রেনটা মিস্ করায়।

বউটি একটু মুচকি হেসে বললে,—লাষ্ট ট্রেণ মিস্ করে আপনার মতো অনেকেই। আমার ঘরে আসতে পারেন। রাতটা ত কাটাতে হবে ?

আমি বউটির কথার উত্তর না দিয়ে ওর পিছন পিছন ওর ঝুপড়ীতে গিয়েই উঠলাম। ওর স্বামী ফিরেছিল একটু পরেই। সে শুলো বাইরের খাটিয়ায়, আমি আর বউটি রইলাম ভিতরে। বউটির তিনটি কাচ্চাবাচ্চা। একটি বাপের কাছে গেল, দুটি মায়ের কাছে।

পরদিন সকালে ওদের দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক দেবার পালা শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায়-কোথায় যে ঘুরলাম, তার ইয়ত্তা নেই। কে আমাকে হুট ক'রে চাকরী দেবে ? মেয়েদের পক্ষেও আজকাল চাকরী পাওয়া সহজ নয়।

শেষ পর্যন্ত, উপায়ন্তর বিহীন হয়ে আবার উঠলাম সেই বান্ধবীরই বাসায়। রাগ তার তখনো পড়েনি, তবে এবার আর বাড়ী থেকে দূর-দূর করে তাড়ালো না। এমন কি মেয়েকে পাঠানোর জন্ম কিছু টাকা ধারও দিলো।

সেই টাকাটা মেয়ের হোষ্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

কিন্তু এভাবেই বা কদিন চলে ? আমার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। একটা পিচ্ছিল পথ অবশ্যই ছিল, অথচ কোথা

থেকে এলো একটা প্রচণ্ড জেদ, আমাকে সুন্দর ভাবে পবিত্রভাবে বাঁচতেই হবে। শুভ-ইচ্ছার বোধহয় একটা ফলশ্রুতি আছে। ক্রমাগত বেশ কিছু দিন অতি কষ্টে আর মনোযন্ত্রণায় কাটানোর পর অবশেষে ভাগ্য প্রসন্ন হলো। খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম, হঠাৎ এলো নিয়োগ-পত্র। কোন্ চাকরীর নিয়োগ-পত্র, তাত বুঝতেই পারছো।

অমিয় চুপ ক'রে শুন্‌ছিল; সুজাতা তার কথা শেষ করার পর সে কিছুক্ষণ ওর বিষয়েই ভাবলো। তারপরে এক সময় বললো,—আজকাল চাকরী পাওয়া এতো কঠিন, এখন তুমি-আমি দুজনেই কিন্তু সাংঘাতিক রিস্ক্ নিলাম।

—জানি। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখান থেকে হরিদ্বার ফিরে আসা পর্যন্ত আর কিছু ভাববো না।

—এ-ও কিন্তু একধরণের ভাবালুতা।

—তা হোক।

বলে, কনুই সরিয়ে মাথাটা এবার বালিশের ওপর নামিয়ে আনলো সুজাতা, চাদরটা গায়ের ওপর ভালো ক'রে টেনে দিলো।

অগত্যা, অমিয় বালিশে ভালো ক'রে মাথা রাখলো। ঘরের এক কোণ থেকে কার যেন বিশ্রী নাক ডাকার শব্দ আস্‌ছে। তার পাশের ছেলেটি ঘুমের ঘোরে কী যেন কথা ক'য়ে উঠলো।

সুজাতার আর সাড়াশব্দ নেই। অমিয়ও ডেকে কোনো সাড়া পেলো না, তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে।

পরের দিন শুরু হলো ওদের যাত্রা। ঋষিকেশ থেকে নরেন্দ্র-নগর হয়ে দেবপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগ থেকে কীর্তিনগর। কীর্তিনগর থেকে শ্রীনগর তিন মাইল পথ। এই শ্রীনগরে আবার বাস-এ

উঠতে হলো। সেখান থেকে ওরা সোজা গিয়ে নামলো গুলাবরাই। গুলাবরাই রুদ্রপ্রয়াগের ঠিক পরপারে, রুদ্রপ্রয়াগের থেকে যায়গাটা ঠাণ্ডা। এখানেও রাত্রিবাস ঘটলো যাত্রীদের মধ্যে একটা বড়ো ঘরে। এবারে কিছু বাঙালী যাত্রী ছিল। পৌঢ়া স্ত্রীলোক চারজন সঙ্গে বর্ষিয়ান দুটি পুরুষ। এঁদের ব্যবস্থায় মেয়েরা শুলো একদিকে পুরুষরা অন্যদিকে।

সুজাতা বললে,—তবু ভীড় কম। বেশী ভীড় হয় রুদ্রপ্রয়াগে।

অমিয় হেসে বললো,—কাকে বল্‌ছো? আমি জানি না?

—তা-ও ত বটে।

ব্যস-আর কোনো কথা নয়। পরদিন সকালে উঠে ওপারে যাওয়া—রুদ্রপ্রয়াগ। মাত্র এক মাইল পথ—কিছুই নয়। অলকানন্দা পার হতে হয়। 'বাস্‌-এ সীট রিজার্ভ করা ছিল, ওরা যথাসময়ে এসে বাসে উঠলো।

অমিয় বললো,—এসব যায়গা তুমি কিন্তু ঘূরে ঘূরে দেখছো না?

সুজাতা বললে,—যাত্রীদের নিয়ে এসে এসব যায়গার ধুলিকণাটুকু পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে, এসব কিছু দেখার ব্যাপারে আকর্ষণ নেই।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ওরা গেল অগস্ত্যমুনি। এখানে ওরা থাকলো। যায়গাটা ভালো লেগে গেল সুজাতার। বললে,—ওদের নিয়ে কি ঘুরে ঘুরে দেখা হয়? এসো দেখি।

ওরা একখানা ঘর পেয়েছিল 'গোবিন্দ-ভবন'-ধর্মশালায়। একেবারে নিছক নিজেদের দুজনের জন্য ছোট ঘর। কিন্তু বিকেল হতে না হতেই সুজাতার মত বদ্‌লে গেল। বললে,—আর না। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

—বাস কই?

পথের বিবরণ সুজাতার জানা। বললে,—এখন যে বাস্‌

পাওয়া যাবে না, সে আমিও জানি। খরচা করছি, ট্যাক্সীতে যাবো। ট্যাক্সী পাওয়া যায়।

—জানি। কিন্তু কতদূরে যাবে, সৌরী?

—না। একেবারে চন্দ্রাপুরী।

চার মাইল পথ। ওরা চন্দ্রাপুরীতে গিয়ে উপস্থিত। একটা দোকানের সংলগ্ন ঘরে ওরা যায়গা পেলো, তা-ও যাত্রীদের ভীড়ে।

বেছে বেছে যাত্রীদের ভীড় পছন্দ করছে সুজাতা, সেটা লক্ষ্য করলেও অমিয় ওর ইচ্ছায় কোনো বাধা দিলো না, সে যেন ওর পথের সঙ্গী, আর কিছু নয়। যেমন বহুযাত্রী নিয়ে অমিয় বেরিয়ে পড়েছিল, এ-ও যেন ঠিক তেমনি. তফাৎ শুধু সংখ্যায়। তখন ছিল 'বহু', এখন,—'এক।'

এরপরে শুরু হলো ওদের হাঁটাপথ। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র—যা বাড়তি দরকার ছিল—তা'সব ঋষিকেশেই সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওরা। সেই সব মোটঘাট 'শিব সিং' বলে একটি কুলির মাথায় চাপিয়ে ওরা রওনা হলো পরদিন সকালে। হাঁটতে গিয়ে সুজাতার আনন্দ যেন আর ধরে না! অমিয় লক্ষ্য করলো, মাথার চুলও বুঝি আঁচড়ায় না, এর মধ্যে জটা ধরতে শুরু করেছে। পরণে সরু ফিতে পাড়ের সাদা ধুতি, কিন্তু ধূলায়-ধূলায় বুঝি গেরুয়া রং ধ'রেছে। যেন এক তপস্বিনীর মূর্তি।

দুই মাইলেরও বেশী চলার পর মন্দাকিনীর সেতু এলো। সেতু পার হয়ে আবার চলা। কুণ্ড-চটি আসবার আগে কিছুটা পথ উৎরাই। ওরা থাকলো না, কুণ্ড-চটি ছাড়িয়ে আরও ক্রোশ খানিকেরও বেশী ক্রমাগত উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছলো এসে গুপ্তকাশী। পথের বর্ণনা আমাদের বিষয়বস্তু না হলেও মাঝে মাঝে পথের কথা অনিবার্যরূপেই এসে পড়ছে।

গুপ্ত কাশীর পর 'নালা-চটি। এই নালা-চটির কথা কখনো

ভুলবে না অমিয়। কারণ, ফেরার পথে এই 'নালা'-চটি হয়েই তাদের বদ্রীনাথের পথে রওনা হতে হয়েছিল। এই 'নালা'-চটি তার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু আপাততঃ যে কথা বলছিলাম। 'নালা'র পর অনেকগুলো চটি পার হয়ে পৌছুতে হয় ত্রিযুগী-নারায়ণ। এখানকার কালী কম্‌লিওলার ধর্মশালায় রাত কাটাতে হয়েছিল যথারীতি অন্য বহু যাত্রীদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছিলেন এক সন্ন্যাসী, মধ্য বয়সী, বেশ ধবধবে চেহারা, রীতিমত সুপুরুষ বলা চলে। তিনি গোমুখ ও গঙ্গোত্রী হয়ে কেদারনাথ যাচ্ছিলেন।

অমিয়কেই প্রথমে ডেকেছিলেন তিনি। বেশ গম্ভীর স্বর। বললেন (অবশ্যই বাংলাভাষায় নয়)—তোমরা কে ?

—তীর্থপথযাত্রী।

—দেখেশুনে ত মনে হচ্ছে না।

—কেন ?

—ও মেয়েটি কে ? যদি তোমার স্ত্রী হবে, ত মাথায় সিঁদুর নেই কেন ?

অমিয়র মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল, বলেছিল,—অনধিকার চর্চা করছেন না কি ?

—মোটেই না—সাধুজী প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলেন,—তীর্থ পথের পবিত্রতা আমাদের বজায় রাখতেই হবে।

—বজায় রাখছি না একথা কে বললে ?

ওদের তর্কাতর্কি শুনে সুজাতা ছুটে এসেছিল কাছে। অন্য যাত্রীরাও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। এবার সুজাতাকে ডেকেই সাধুজী বলে উঠলেন,—বলো ত মায়ী, ও তোমার কে ?

সুজাতা উত্তর দেবার আগে অমিয়ই কথা বলেছিল। বলেছিল

—আমি বলছি। আমার বন্ধু। এর বেশী কিছু আপনাদের জানবার দরকার নেই, চলে এসো সুজাতা।

ওরা চলে এসেছিল। তখনকার মতো গুঞ্জনটা থামলেও কেদারনাথ তীর্থে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। স্পষ্টভাবে সোচ্চার কেউই নয়, কিন্তু অনেকের দৃষ্টিই ওদের দিকে। ওদের নিয়ে যে একটা কিছু ওরা বলছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সুজাতা প্রথমটায় বুঝিবা একটু ভয়ই পেয়েছিল।

অমিয় বললে,—কথায় কান দিলে চলবে না। দেখতে এসেছো, প্রাণভ'রে দেখে নাও।

কেদারনাথ-মন্দিরের পরিবেশ কখনো ভুলবার নয়। মন্দিরের পরপারে যে মহিমময় তুষার-কিরীটিনী পর্বত-শিখর দণ্ডায়মান, তার সৌন্দর্যকে যেন নতুন ক'রে ত্বটি চোখ ভ'রে পান করলো সুজাতা।

—কি দেখ্ছো?

ও বললে,—আগেও ত এসেছি, কিন্তু এমন ক'রে ত দেখিনি!

অমিয় চুপ ক'রে রইলো।

সুজাতা বলে উঠলো,—এখান থেকে যদি ফিরতে না হতো।

অমিয় মৃত্তকণ্ঠে বললে,—এটাও তোমার জীবনের একটা সাধ নাকি?

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো। জটাপাকানো রুক্ষ চুল, পথশ্রান্তিতে শরীর কাতর, তার ওপরে শীতের স্পর্শ, তবু মুখখানা যেন এক অদ্ভুত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললে, যদি সাধ হয়েই থাকে, তুমি পূর্ণ করবে?

অমিয় তেমনি গভীর কণ্ঠেই বললে, না করবো কেন? তোমার সাধ পূর্ণ করতেই ত তোমার পথসঙ্গী হয়ে আসা। নয় কী?

সুজাতা বললে,—দেখ, এর থেকে পুণ্য স্থান আমার কল্পনায় আসে না। এসো আমার সঙ্গে?

—কোথায় ?

—এসোই না।

বলে, ওকে নিয়ে গেলো একেবারে মন্দিরের পিছনে। কাপড়ের ওপর সুজাতা একটা সাদা পুরোহাতা সোয়েটার প'রেছিল, গলায় সাদা মাফলার। অমিয়র গায়ে টুইডের প্রিন্স কোট্, তার ওপরে গরম চাদর, তবু সে শীতে কাঁপছিল ঠক্‌ঠক্ ক'রে।

ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর ঝোলা থেকে একটা ছোট কৌটো বার করলো সুজাতা।

—ও কী ?

—সংগ্রহ করেছি। ঐ সেই সাধুজীর কাছ থেকে।

—তাঁর কাছে ছিল নাকি ?

—না। তিনি তাঁর শিষ্যদের কারুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিলেন।

অমিয় ওর কথা শুনে উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সাধুজীকে কী গিয়ে বললে ?

সুজাতা বললো, শিলাজতু কিনতে গেলাম না ? তুমি তখন বসে বসে চা খাচ্ছিলে। ওঁর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করতেই বললেন তীর্থে মিথ্যাচরণ ক'রো না মা, তাতে ভালো হয় না। আমি তৎক্ষণাৎ-চাইলাম এই জিনিষটা। উনিও অদ্ভুত, চেয়ে চিন্তে ঠিক যোগাড় করে দিলেন।

—করিৎকর্মা আছেন।

সুজাতা পূর্ব প্রসঙ্গে যাবার প্রয়াস করলো। বললো, সে যাই হোক, এবার আমার কথাটি শোনো। আমাকে তুমি পাগল মনে করবে, তা আমি জানি। তবু বলবো, আমার এ সাধটাও তুমি পূর্ণ করো। আমার কোনো দায় দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না। আমি সারা জীবনে যাতে ক'রে মনে মনে একজনকে আমার পরম

আত্মীয় বলে ভেবে যেতে পারি, এ সেই অধিকারেরই কোনো চিহ্ন মাত্র। এ সম্পূর্ণ আমার জন্য। একে তুমি স্বার্থপরতাও বলতে পারো। আমার জীবনে এটার প্রয়োজন আছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজন। আর কিছু না।

অমিয় স্থির দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শুনছিল। চেহারায় ওর একটা অদ্ভুত দিব্য ভাব এসেছে, ওর তপস্বিনী মূর্তি যেন এই মনোরম পরিবেশে ভারী সুন্দর মানিয়ে গেছে!

মন্দিরের সম্মুখভাগে তখন 'ঢং ঢং' ক'রে ঘণ্টা বাজছিল, হিমগিরির চূড়ায় চূড়ায় সোনালী রৌদ্রের ছোঁয়া, ঘরের ভিতর থেকে একটা স্তোত্রপাঠের সুর শোনা যাচ্ছে।

সুজাতার সিঁথিতে সিঁদুর ছোয়ানো মাত্রই ও নীচু হয়ে ওকে প্রণাম করলো। কিন্তু তার পরেই আর দাঁড়ালো না, বললে, এসো।

—কৌটোটা?

—আমার হাতে দাও।

কৌটোটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই চলতে লাগলো।

কেদারে একরাত্রি কাটাতে হয়। এখানেও ওরা রাত কাটালো ভিন্ন যাত্রীদের সঙ্গে। পরদিন ওরা যাত্রা করে বেরুবে, ঠিক মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সেই সাধুজীর সঙ্গে।

সাধুজীর মুখে মৃদু মৃদু হাসি, সুজাতা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন,—এইবার ঠিক আছে সত্যকে স্বীকার ক'রেছো।

অমিয় কোনো কথা বলে নি, কিন্তু পথ চলতে চলতে একথাই সেদিন তার মনে জাগছিল—সত্যটা কী, এবং কোথায়? তাদের মধ্যে কোনো নিবিড় সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে কী? নিজেকে অমিয়

ওর পথসঙ্গী ছাড়া আর কী ভাবতে পারে? টান একটা অনুভব করে ওর জন্য, কিন্তু সেটা শুভাশুভের ভাবনা, এই পর্যন্ত। নানান্ তীর্থযাত্রীদের যেমন সে দেখতো, এও তেমনি।

ওর তপঃক্লিষ্ট মুখ দেখে তার ভালো লাগছে, কিন্তু এই স্বর্গরাজ্যে তার বেশী কিছু সে ত অনুভব করে না? সিঁদূরের স্বীকৃতি তাকে আরও নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে টেনে নামাতে পারতো এ-কথা ঠিক, কিন্তু সে অভিলাষ উদগ্র হয়ে ওঠে কোথায়? এই হিমালয়ের পথে প্রান্তরে চলতে চলতে পরস্পরের সঙ্গটাই হচ্ছে সব থেকে বড়ো কথা, স্ত্রীপুরুষের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের থেকেও বড়ো কথা। এটা অসম্ভব কিছু নয়, স্থানমাহাত্ম্য একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ফিরবার পথে সেই 'নালা-চটি'তে, যা অভাবিত, তা-ই ঘটে গেল যে ঘরটিতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল ক্লান্ত দেহে, বিকেলের কিছু আগেই অন্য যাত্রীরা সেঘর ছেড়ে রওনা দিলো। ওরা দুজন ছাড়া কেউ রইলো না সেই ঘরে। পরস্পরের বিছানা যদিও পরস্পরের থেকে অনেক দূরে, তবু এক অবিশ্বাস্য ভীতি যেন অধিকার ক'রে বসলো সুজাতাকে।

ফেরার পথে হাঁটতে এবার সুজাতারই কষ্ট হয়েছিল বেশী; ওর পায়ে হয়েছিল ভীষণ ব্যথা। যার জন্য নালা ছেড়ে আর অগ্রসর হতে ওরা সেদিন পারলো না।

—কী হবে?

অমিয় আজ একটু হাসলো, বললো,-এতদিন ত ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলে, এবার আমারও প্রশ্ন, সত্যিই কি হবে?

সুজাতার চোখের প্রান্ত দেখতে দেখতে ভিজে উঠলো, বললো স্বর্গ কোথায় আছে জানি না, কিন্তু মানুষের মন কোথাও এক স্বর্গ আছে ভেবে নিয়ে আশ্বস্ত বোধ করে। বিশেষ ক'রে সেই মানুষের মন, যে নরকের পাঁকে ডুবে যেতে বসেছিল। জীবনে

নরক দেখেছি বলেই স্বর্গের আকাঙ্খা আমার কাছে এতো প্রবল : আমার মন এই তীর্থকেই স্বর্গ বলে মেনে নিয়েছে। এই স্বর্গের পথে নরককে টেনে আনতে তাই এতো ভয়। তাই এত বাঁচিয়ে চলছি নিজেকে।

অমিয় ওর অন্তর্দ্বন্দ্বের সুরটাকে অনুভব করলো। গভীর কণ্ঠে বললে, দেখ, একটা কথা বলি, মিথ্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করছো, আমার দিক থেকে তোমার কোনো ভয় নেই।

সুজাতা এবার স্পষ্টতই কেঁদে ফেললো, বললো, জানি। কিন্তু ভয় আমার দিক থেকে।

এবার বুঝি অমিয়রই অবাক হবার পালা, বললো, সে কী!

সুজাতা বললে, নিজেকে কেন এতো শাসন করে চলেছি, বুঝতে পারছো না? ফেরার পথ যতো এগুচ্ছে ততই ভিতরের দুর্বলতাটা বাড়ছে, কারণ, হরিদ্বারেই ত আমাদের সব শেষ! তখন দুজনে দুজনের পথে চলে যাবো—আর দেখা হবে না।

আর কোনো কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। অমিয় যেন অনন্ত ভাবনার অবগাহনে অবতরণ করেছে; সুজাতাও তাই।

পরবর্তী কালে, অমিয় ভেবে দেখেছে, নালা-চটির সেই অদ্ভুত রাত্রিটি যতোই গভীর হচ্ছিল, ততই যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল সুজাতা। একই ঘরে দুটি বিছানা—যদিও ঘরের দুটি প্রান্তে—তবু সুজাতার যেন ভয়ের সীমা ছিল না। ওর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা ভীতি সঞ্চারিত হচ্ছিল। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও নিস্তার নেই, বার বার তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি কোনো লালসার বলিষ্ঠ হাত এসে তার সমস্ত লজ্জা আর সংকোচের আবরণ ডাকাতের মতো লুণ্ঠন করে নেয়।

নিঃশব্দ রাত্রি। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, অদূরে লণ্ঠনটা জ্বলছে স্তিমিত শিখায়,—তবু সারারাত ঘুমোতে পারেনি সুজাতা।

নিজের মনকেই বারবার সে প্রশ্ন করেছে—কী চাই—কী চাই আমি? সিঁথিতে সিঁদুর, অথচ মাথার চুলে ওর জটা,—একদিকে কামনা-বাসনার ঢেউ, অন্যদিকে বৈরাগ্যের ধূ-ধূ প্রান্তর।

আসলে অদ্ভুত একটা গ্লানিবোধ ওর মনটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে, যা, থেকে এত কৃচ্ছ্রসাধনার পরও মুক্ত হতে পারছে না সুজাতা। স্বর্গরাজ্যের সীমান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ালেও মনে হচ্ছে শুচিশুভ্র স্বর্গরাজ্যের দ্বার ওর কাছে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে।

অমিয় কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত্রি শেষ হবার মুহূর্তে হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল, ফুঁপিয়ে ওঠা একটা কান্নার শব্দে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো অমিয়। হারিকেনটা আপনিই কখন তেলহীন হয়ে নিভে গেছে। জানালার বাইরে ঈষৎ স্বচ্ছতার আভাষ। বেশ বোঝা যায় ভোর হচ্ছে।

অমিয় এগিয়ে গেল। ঝুঁকে দেখলো। কম্বলের মধ্যে গুমরে ওটা কান্নায় সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে সুজাতার।

—কী হলো, কাঁদছো কেন?

ওর কণ্ঠস্বরে সে কান্না যেন আরও উত্তাল হয়ে উঠলো।

—কী মুশকিল, কী হলো তোমার?

কোনো উত্তর নেই। অমিয় ওর মাথার ওপরে হাতখানা রাখলো। কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাতটা সরিয়ে দিলো সুজাতা, যেন ছুঁড়ে দিলো।

অবাক হলো অমিয়। সে কান্নার কারণটা বুঝলো না, ওর হাতটা ছুঁড়ে দেওয়ার কারণও বুঝলো না।

এবং সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, সকালের আলো ভালো ক'রে ফুটে ওঠ্‌বার পর সুজাতা যখন বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো, তখন সে নতুন মানুষ। কান্নার চিহ্ন কোথাও নেই,

সে আবার সেই সহজ মানুষটি হয়ে গেল। বললো,—দেরী করোনা, তাড়াতাড়ি রওনা দিতে হবে।

নাল-চটির এই অদ্ভুদ ঘটনা অমিয়র মনে গভীর রেখাপাত করলেও সে এ নিয়ে কোনো কথা বললো না। সুজাতাও ঐ প্রসঙ্গে নীরব।

শুরু হলো আবার ওদের চলা। সুজাতা সিঁথির কাছটায় একটু চিরুনী ছোঁয়াতো, এরপর সে চিরুণীটাও ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বললো,—দূর, কী হবে এসব দিয়ে?

অমিয় ওর কথার কোনো উত্তর দেয়নি। উশীমঠ হয়ে গণেশ চটি। গণেশচটির পর উৎরাই আরম্ভ। পথের দুপাশে জঙ্গল। পোথীবাসা হয়ে বানিয়াকুণ্ডের কালীকমলিওয়ালার চটিতে যখন এসে পোঁছলো, তখন ওরা রীতিমত শ্রান্ত।

সুজাতা ঘরের কোনে ব'সে পড়ে বললে,—বাব্বাঃ! কী ভীষণ জঙ্গলই না আমরা পার হয়ে এলাম!

অমিয় বললে,—কেন, গতবার যখন যাত্রীদের নিয়ে এসেছিলে, তখন মনে হয়নি?

সুজাতা বললে,—তখন সঙ্গে অনেক লোক ছিল।

অমিয় বললো,—এবারও ত একা ছিলে না। তীর্থযাত্রী ত আরও ছিল।

সুজাতা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো,—কী, তুঙ্গনাথ যাবে নাকি?

—যা তোমার ইচ্ছে।

বাঃ! তোমার ইচ্ছে বলে কিছু নেই বুঝি?

—না। আমি তোমার তীর্থসঙ্গী, এই পর্যন্ত।

সুজাতা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে,—বেশ, পাণ্ডাগিরিটা ভালো করেই করো। নিয়েচলো তুঙ্গনাথ।

'তুঙ্গনাথ' খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে হয়—পথের দুর্গমতাও আছে। কিন্তু পৌঁছবার পর মন যেন জুড়িয়ে যায়! বরফঢাকা পর্বত-শৃঙ্গগুলি দেখা যায়।

যাত্রীরা এ ওকে দেখাচ্ছে,—ঐ দেখ নন্দাদেব, ঐ দেখ পণ্টচুলি, ঐ দেখ গন্ধমাদন, ঐ দেখ দ্রোণাচল।

আরও উত্তর দিকে ওরা দেখছিল, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, আর গঙ্গোত্রী সন্নিহিত পর্বত-শৃঙ্গগুলি।

তুঙ্গনাথ থেকে তিন মাইল উৎরাই পথ নামতে হয়। নামবার পর ভীমচটি। গভীর অরণ্য পথ। মঙ্গল চটির পর আর অরণ্য নেই।

এম্‌নি করে করে ওরা এসে পৌঁছলো চামোলীতে। চামোলী থেকে বাস ধরে যোশী মঠ। যোশীমঠ থেকে আবার হাঁটা সুরু। শেষ পর্যন্ত—বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথেও যাত্রীদের মধ্যে থাকা। অমিয় বললে,—চুলে তেল দিয়ে ভালো করে স্নান করো।

ও বললে,—স্নান তো করবোই, কিন্তু চুলে তেল দেবো না।

—শেষে জটা আর ছাড়াতে পারবে না।

—না-ই বা পারলাম।

বদ্রীনাথে রাত্রি ভোর হবার পর সুজাতা বললে,—এই, সত্যপথ যাবে? তের মাইল মাত্র।

অমিয় বললে,—হ্যাঁ, তেরো মাইল আর কী! গেলেই হয়।

কিন্তু সুজাতার মত বদলালো পরদিনই। বললে,—না থাক, ভীষণ দুর্গম রাস্তা, সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া কেউ যেতে চায় না।

অমিয় বললে,—আমরা কি সাধুসন্ন্যাসীর থেকে কিছু কম?

সুজাতা বললে,—ছি।

তার পরেই বললো,—না বাপু কাজ নেই—ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরিয়ে দেওয়া ভালো। চলো, ফিরে চলো যোশীমঠ। সেখান থেকে বাসে একেবারে হরিদ্বার। আর কোনো কথা নয়।

—বেশ।

এইভাবে ওরা কঠিন পথযাত্রা শেষ করে ফিরে এলো হরিদ্বার। কুশাবর্ত ঘাটের কাছে একটি পাণ্ডাঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করলো ওরা দুজন—। চেনাজানা গঙ্গা বোর্ডিং-এ ওরা গেল না।

অমিয় বললো, কয়েকটা দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে নাও।

সুজাতার ঠোঁটের কোনে ম্লান হাসি। বললে,—কী দরকার? বিশ্রাম একেবার ক'লকাতায় গিয়ে। যে-যার পথে।

অমিয় গম্ভীর হয়ে বললে,—আমি তোমার কথাই ভাবছি।

সুজাতা স্নান শেষ করে এসে তার সেই জটা পরা চুলের সূক্ষ্ম সিঁথিতে সিঁদুর ছোয়াচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে,—কী কথা?

অমিয় বললো,—তোমার চাকরীটা যদি চ'লে গিয়ে থাকে?

ও অল্প একটু হাসলো, বললো,—ও গেছেই।

—তাহলে? তোমার চলবে কী করে?

— যা হোক করে যাবেই। আর ভাবি না।

—তোমার মেয়ে?

মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে উঠলো,—কে জানে কী হবে।

অমিয় বললো,—তোমাকে ও কাজ খুঁজে নিতেই হবে, কী বলো?

সুজাতা বললো,—তা বলে নীচে আর নামবো না।

—জানি।

ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ ক'রে অমিয় সরে এলো ওর কাছ থেকে। একেবারে ঘর থেকে পথে। আজকাল নিজেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ কম। গঙ্গার ধারে এসে ও বোধ হয় হঠাৎ সেই দুর্লভ মুহূর্তটুকু খুঁজে পেলো।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘাটে একা একা বসবার পর অমিয় গেল

সিটি বুকিং অফিসে। ট্রেনে তখন ভীষণ ভীড়। জনতার স্লিপিং সিট্ জোগাড় করে ও যখন ওদের সেই ছোট ঘরখানায় ফিরে এলো। তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে।

ছোট্ট ঘরখানা—পাশাপাশি দুটি খাটিয়া—মাঝখান দিয়ে একটি মানুষ যাতায়াত করতে পারে মাত্র। অপর খাটটিতে নিশ্চুপে বসেছিল সুজাতা—প্রস্তর মূর্তির মতো ও কাছে যেতেই তাতে যেন প্রাণ-সঞ্চার হলো। বললে,—কোথায় গিয়েছিলে ?

অমিয় বললো,—ট্রেনে ভীষণ ভীড়। এ্যাড্ভান্স টিকিট্ কাটতে হলো।

—কোথাকার ?

—কোথাকার আবার; ক'লকাতার ? অমিয় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে,—এ প্রশ্ন কেন ?

—আবার ক'লকাতা' কেমন যেন একটা ক্লান্ত সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো সুজাতার কণ্ঠে।

অমিয় বললো,—কী, যেতে চাওনা, কলকাতা ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতা বললো, না গিয়ে আর করছি কী ?

— তবে ?

দেহে একটা শৈথিল্যের তরঙ্গ তুলে সুজাতা বললো,—তবে আর কী ? এম্নি কথাটা বললাম। তা, কবে গুটোতে হবে তল্পীতল্পা ?

অমিয় দিলো ছোট্ট উত্তর,—আজ থেকে ঠিক চতুর্থ দিন।

'চতুর্থ দিন' শব্দটা কানে যেতেই চকিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো সুজাতা।

অমিয় বললো,—টিকিট কিনে পুঁজি এখনো ফুরোয় নি দেখ্ছি। কিছু আছে। দাঁড়াও কয়েকটা টুকীটাকী জিনিষ কিনে আনি।

—কী কিন্বে ?

—যা হয়।

—তা হলে এখ্খুনি বেরুচ্ছো কেন?

অমিয় বললে,—পাহাড়ে পাহাড়ে যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ ছিলাম একরকম। যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘুরে বেড়িয়েছি।

এখানে এসেই মনে হলো, মাটিতে পা পড়েছে—পায়ের নীচে শক্ত মাটি। মানে বোঝো?

—বুঝিয়ে দাও?

অমিয় ওর খাটের প্রান্তে বসে পড়লো, বললো,—তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও?

ও বসামাত্রই সুজাতা সোজা হয়ে উঠে বসলো. ওর ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু-বা সরেও গেল। তারপরে বললো,—কী?

—তুমি কি সন্ন্যাসিনীই থাকতে চাও নাকি?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সুজাতার মুখ। একটু কী যেন ভাবলো নিজের মনে, বললো,—এবারে গেরুয়া কাপড় পরলেই ভালো হতো। কিন্তু মেয়েটার কথা ভেবেই আর সে-দিকে পা ফেলতে পারছি না।

—আর ঐ জটা?

নিজের বুকে হাত দিয়ে তা অনুভব করলো কয়েক মুহূর্ত. তারপরে উত্তর দিলো,—থাক না—কলকাতায় গিয়ে যা হয় করা যাবে।

অমিয় বললে,—নিজের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখছো. আয়নায়?

মুখখানা একটু আরক্তিম হয়ে উঠলো সুজাতার, বললো,—কী দেখবো? ভীষণ রোগা হয়ে গেছি, এইত?

—তা'ত হয়েছোই, আমি সে-কথা বল্‌ছিনা,—অমিয় বললো,—মুখখানার দিকে ভালো করে তাকিও—যেন জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে!

বলেই, অমিয় আর দাঁড়ালো না, চট্ ক'রে সরে গেলো একেবারে ঘর থেকে গলিটায় কয়েক পা হাঁটবার পরই পাণ্ডা-ঠাকুরটির সঙ্গে দেখা। বুড়ো মানুষ। দেখা হলেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা টেনে আনেন। বললেন,—যাচ্ছেন কোথায় বাবুজী ?

—এই একটু বাজারের দিকে।

—তর্পণ-টর্পন করবেন না ?

এক মুহূর্ত ভাবলো অমিয়। যাত্রীদের নিয়ে যখন তীর্থে-তীর্থে ঘুরেছে, নিজে তর্পন কখনো করে নি, তা করতে মন চায় নি। এবারও যে সে স্বর্গ্যরাজ্য ঘুরে এলো সুজাতার সঙ্গে এবারও তর্পন-টর্পনের কথা মনে হয়নি। পাণ্ডাঠাকুটির কথায় হঠাৎ মনে হলো,—মন্দকী আর কিছু না হোক সুজাতার কী প্রতিক্রিয়া হয়. এটাও ত লক্ষ্য করা যাবে ?

অমিয় উৎসাহিত হয়ে পাণ্ডাঠাকুরকে বললে,—আপনি ব্যবস্থা করুন। কালই।

—আচ্ছা বাবুজী।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমিয় সত্যিই বাজারে এলো। দোকান-টোকান ঘুরে অনেক পছন্দ করে দুটো শাড়ী কিন্‌লো সে—মোটামুটি মাঝারী দরের। একটি গোলাপী রঙের, অন্যটি শাদা খোলের ওপরে ফুলের কুঁড়ির ছাপ তোলা। আর কিন্‌লো একটি চিরুনী, একটা সুগন্ধি তেলের শিশি, আর কিছু টুকিটাকি জিনিষ।

বাড়ী এসে সে-গুলো সুজাতার সামনে এগিয়ে দিতেই ও আবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো,—এসব কী ?

অমিয় সংক্ষেপে বললো,—সিঁথিতে যখন সিঁদুর দিয়েছো, তখন শাড়ী পরাই উচিত।

সুজাতা চুপচাপ কয়েকমুহূর্ত কথাটা ভাবলো, কিন্তু কোনো প্রসঙ্গ আর তুললো না।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যাবার পর নিজের বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিতে দিতে অমিয় বললো,--কাল তর্পণ করছি।

—তাই নাকি? বিশ্বাস করো আর না করো?

অমিয় বললো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, তবে, মনে হলো, আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে যে একটা গ্লানিবোধ জ'মে আছে, তা' বোধ হয় কিছুটা ক্ষয় হয়ে যাবে।

সুজাতা সাগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকালো, বললো,—তোমার মনে আবার গ্লানিবোধ কিসের?

অমিয় উত্তর দিলো,—তোমারই বা এত কৃচ্ছসাধন কীসের বলতে পারো?

সুজাতা চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললো না। এবং সেই থেকে ওর যে কী হলো, চুপচাপ রইলো, যেন কী-সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। বিকেলে অমিয় বললো,—বেরুবে না?

নিজের বিছানায় কেমন এলিয়ে শুয়েছিল, তেমনি করেই প'ড়ে রইলো সুজাতা, সংক্ষেপে বললো,—না।

তুমি যাও ঘুরে এসো।

অমিয় আর পীড়াপীড়ি করলো না, একাই বেরিয়ে গেল। হর-পৈড়ার সু-উচ্চ ঘড়ি ঘরের নীচে অনেকক্ষণ বসে রইলো। বাড়ী যখন ফিরলো, তখন অনেক রাত। সুজাতা পাণ্ডাবাবুদের পরিবারস্থ একটি বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে মত্তছিল। ও আসার পর বউটি চলে গেল, সুজাতা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হলো। সে-সব চুকে যাবার পর ঘুমিয়ে পড়বার পালা। তখন ওদের দেখলে মনে হতো, দুটি মানুষ নয়, যেন যন্ত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণ করার মধ্যে কিছু

নেই। এমন কি কোনো গল্পও ওরা করলো না নিজেদের মধ্যে যে-যার বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

পরদিন সকালে অমিয় যখন কুশাবর্ত ঘাটে তর্পন করতে বসলো, তখন সুজাতাও এলো অনুষ্ঠান পরিদর্শন করতে। চুপচাপ বসে-বসে সে সবই লক্ষ্য করলো।

এবং তারপরই অমিয় পর্যবেক্ষণ করলো ওর পরিবর্তনটা। স্নানান্তে সুজাতা পরলো সেই গোলাপী শাড়ীটা. আর আশ্চর্য, মাথায় বহুদিন পরে তেল ঢাললো চিরুণী নিয়ে চুলের জট্ ছাড়াতে বসলো।

ওর প্রসাধন পর্ব সারা হয়ে যাবার পর অমিয় বললো,—এইবার সুন্দর লাগছে।

মুখখানা কী এক লজ্জার অনুভূতিতে মুহূর্তে আরক্তিম হয়ে উঠলো। সুজাতা মৃদু ঝংকারে বলে উঠলো,—বাজে ব'কোনা।

অমিয় প্রশ্ন করলো,--তারপর ? ভেবে কী স্থির করলে ?

—কী আবার স্থির করবো ?

—কাল থেকে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছো,—এটা কি আমি বুঝতে পারিনি ?

সুজাতা ওর দিকে মুখ ফেরালো, একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলো,—দেখো, তুমি আমার সম্বন্ধে মনে-মনে কী ভেবে রেখেছো জানি না, আমি তোমাকে এটুকুই বলবো,—সিঁথিতে সিঁদুর নিয়েছি নেহাৎ-ই দায়ে পড়ে,—আত্মরক্ষার খাতিরে,—তার জন্য তোমার ওপর সত্যিই কোনো দায় দায়িত্ব আমি চাপাবো না। তবে হ্যাঁ, একটা সুবিধা নেবো। মানুষের সমাজে যখন বাস করতে হবে, তখন মানুষের কৌতুহলটা মেটানোর জন্যই শুধু বলবো, আমার স্বামীর নাম শ্রীঅতনু কুমার—

বলেই একটু থেমে, ওর দিকে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলো,—ঐ যাঃ! তোমার উপাধিটাও যে জানি না!

অমিয় বললো,—ওটাও বানিয়ে নাও না ?

—সব কিছুই বানানো যায় না,—সুজাতা বললে,—বলো না, তোমার উপাধি কী ?

—মুখোপাধ্যায়।

—ব্যস।—সুজাতা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে,—এবার চাকরীর চেষ্টা করতে যেখানেই যাবো, আর আমাকে মুশকিলে পড়তে হবে না। অতনুকুমার মুখোপাধ্যায় আমার সিঁথি আলো ক'রে থাকুন।

ব'লে নিজেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেললো সুজাতা।

অমিয়র মুখখানা কিন্তু আরও গম্ভীর হলো। সে বললে দেখ, তোমার মতো আমিও একটা চিন্তার মধ্যে ডুব দিয়েছিলাম। এবার তাহলে আমার কথাটা শোনো। সিঁথিতে সিঁদুর যখন নিয়েছো তখন তার পরেরটাও তোমাকে মানতে হবে। এখান থেকে আমরা ক'লকাতায় যাচ্ছি। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই যে যার পথে চলে যাবো, তা' হবে না। আমার বাড়ীতেই তুমি যাবে। তোমার সব দায়িত্বই আমি নিলাম। নিতে আমি বাধ্য।

যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো সুজাতা, বললো—বাধ্য কেন হবে ?

অমিয় সংক্ষেপে বললো,—নিজের মনটাকে জিজ্ঞাসা করো। উত্তর পাবে।

সুজাতার সারা দেহটা যেন মুহূর্তের জন্য থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। তার মনে হচ্ছিল প্রবল এক দুর্বলতার ঢেউ এসে বুঝি তার সব কৃচ্ছ্রসাধন—সব সংযম মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। প্রাণ পণে নিজেকে সে সামলে রাখলো। মুখ নীচু করলো। শক্ত হাতে খাটের একটা প্রান্ত আঁকড়ে রইলো।

অমিয় বলতে লাগলো,—যা তোমার সারাজীবনের সাধ, তা আমি জানি। প্রেম। সংসারে ক্রমাগত ঘা খেতে ঘা খেতে ঐ প্রেমের অনুভূতিটাই বোধ হয় মরে গেছে। আমি শুধু এটুকু

জানি, তোমাকে আমার প্রয়োজন। বোধ হয় তোমারও আমাকে প্রয়োজন। তোমাকে পেলে আমি খুসী হবো। আর আমিও চেষ্টা করবো তোমাকে খুসী করতে।

কথাগুলো সুজাতার কানে প্রবেশ করছিল এমনভাবে, যে, সে যেন দূরাগত কোনো ধ্বনি শুনছে। যেন বিবাহের মন্ত্রের মতো কথাগুলো তার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলে ফিরতে লাগলো।

ওরা আর এ সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি, যেন একটা সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয়ে গেছে, আর এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই —এই রকম হলো মনের অবস্থা। বাকী সময়গুলো হরিদ্বারে ওরা ঘুরে কাটালো। মনসা-পাহাড়, চণ্ডী পাহাড় থেকে কনেখল,—সব ওরা ঘুরে দেখতে লাগলো।

চণ্ডী পাহাড়ে উঠে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠলো সুজাতা, বললো,—দেখেছো? এখান থেকে শহরটা কী রকম দেখাচ্ছে? যেন খেলাঘরের শহর, তাই না?

—হুঁ।

তারপরে ট্রেনে উঠে ওর মনে হলো ভাবান্তর। সব উচ্ছ্বাস থেমে গেল, সুজাতা চুপচাপ ভাবতে লাগলো। এক একবার মনে হচ্ছিল অমিয়কে বলে,—এই, সেই কথাগুলো আরেকবার বলো না?

কিন্তু মুখ ফুটে সে জিজ্ঞাসা আর করা হলো না।

অমিয় হাওড়ায় নেমে একই ট্যাক্সিতে দুজনের জিনিষপত্র ওঠালো। ট্যাক্সীটা ছেড়ে যখন হাওড়ার ব্রীজ পার হচ্ছে, তখন কথা বললো সুজাতা। বললো,—আমার বড্ড ভয় করছে, জানো?

—কীসের?

সুজাতা বললো,—বাড়ীতে গিয়ে কী পরিচয়?

—এ কথাও কি মুখ ফুটে বলতে হবে?

—মা রাগ করবেন না ?

অমিয় বললো,—যদি করেনই, মা তো ? দুজনে মিলে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করবো

সুজাতা কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো। তারপরে এক সময়ে বললো,—চাকরী নেই, বাকরী নেই, কী যে হবে—কে জানে।

—চেষ্টা করতে হবে।

বাড়ীতে ট্যাক্সী থেকে নেমে, মাকে প্রণাম ক'রে অমিয় বললো —মা, তোমার বউ। ব'লে, সেই যে লজ্জা পেয়ে তার ঘরের কোনে আশ্রয় নিলো, আর তার মুখখানা দেখবার উপায় নেই।

দাদাকে খুঁজতে খুঁজতে সুলতা একসময় ঘরে এলো। হাসি-হাসি মুখ। হঠাৎ-ই হেঁট হয়ে ওকে প্রণাম করলো।

—এ আবার কী ?

সুলতা বললো,—তোমার জয় হোক! তুমি কি ক'রেছ ?

—কী ক'রেছি ?

সুলতা অল্প একটু হেসে বললো,—তোমাদের জামাই বাড়ী আসুক, ওর মুখেই সব শুনতে পাবে।

—কী শুনবো ?

সুলতা বললো,—চাকরীতে ইস্তফা দেবার কী দরকার ছিল, অ্যাঁ ? তোমার চাকরীর মালিক তোমাদের জামাইকে ডেকে পাঠায় নি ? তুমি যে একটি মেয়েকে নিয়ে বদরীকাশ্রম ঘুরতে গেছো চাকরীতে জলাঞ্জলী দিয়ে,—এ খবর কি চাপা থাকে ?

—তারপর!

সুলতা বললো, একটু খোঁজখবর করতেই সব জানাজানি হয়ে গেল। তোমার মতন উনিও চাকরী থেকে পালিয়ে ছিলেন তবে, সুখবরটা এখন জানাই। তোমাদের দুজনের একজনেরও চাকরী যায় নি। বোঝা যাচ্ছে, দুজনেরই মানুষের মন জয়

করবার ক্ষমতা অদ্ভুত। দুপক্ষের দুই মালিকই তোমাদের ওপর খুসী। এবার গিয়ে যে-যার মালিকের সঙ্গে দেখা করো। নাকি বৌদিকে চাকরী করতে দিতে চাও না।

উত্তেজনায় অমিয় ততক্ষণে উঠে বসেছে। বললো,—তোর বউদি সব জানে? বলেছিস?

—বলেছি বই কি!

—কী করছে সে?

—মায়ের কাছে—মায়ের ঘরে।

—হ্যাঁরে, মা সব জানে?

—জানে বই কী!

—রাগ করে নি?

সুলতা বললে,—যে মা আমার বিয়েকে মানিয়ে নিতে পারে, সেইমা না পারে কী?

অমিয় বললো,—তবে বোন্। ওর একটি মেয়ে আছে। হোষ্টেলে থাকে।

সুলতা একটুক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললো,—বৌদি—মানে—

অমিয় বললো,—সব শুনেছিস—আর এটুকু শুনিস নি?

সুলতা বললো—অতো শোনাশুনির দরকারই বা কী? সে আমার বৌদি—এটুকুই আমার কাছে যথেষ্ট। তবে এ-খবরটা মা কী ভাবে নেবে—দাঁড়াও আসছি।

বলে, চলে গেল সুলতা।

সুজাতার সঙ্গে অমিয়র দেখা হলো আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে। মুখখানা উজ্জ্বল। বললো,—এ-রকম অদ্ভুত মা আমি দেখি নি। কী বললেন জানো?

—বলছিলেন আজই গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসবে। হোষ্টেলে থেকে পড়বে কেন ?

—মা বললেন।

—হ্যাঁ।

অমিয় বললো,—চলো, আমরা দুজনেই যাই। ওকে নিয়ে আসি।

সত্যিই, আশ্চর্য ওদের সংসার। মেয়েটিকে অমিয়র মা একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—দেখত, এমন ফুটফুটে মেয়ে, একে ছেড়ে মা থাকে কী করে ?

সেই থেকে মেয়ে তার ঠাকুরমার কাছেই মানুষ হতে লাগলো, তার পাশটিতেই সে শুতে লাগলো। সুজাতা বলতো,—বড্ড আদর দিচ্ছেন কিন্তু আপনি।

বৃদ্ধা হেসে বললেন,—একটু বেশী আদর ওরই পাওয়া দরকার।

অমিয়-সুজাতার দাম্পত্য-জীবন হলো বিচিত্র যে-যার চাকরীতে ওরা বহাল হলো। নূতনত্বের মধ্যে সুজাতার পরণে শাড়ী, সিঁথিতে সিঁদুর। সে যাত্রীদল নিয়ে চললো রামেশ্বর-সেতুবন্ধ, আর অমিয় চললো তার যাত্রী নিয়ে কাশ্মীর-অমরনাথ।

সুজাতা একবার তার মাকেও সঙ্গে ক'রে ঘুরিয়ে আনলো। মা তীর্থ করবে কী, সুজাতার মেয়ের জন্য তার মন কাঁদতে লাগলো। বারে বারে বলতে লাগলেন,—খুকুকে আনলে ভালো হতো। কেমন ধারা মা গো তুমি, বউ মা ?

সুজাতা বললো,—ওর পড়াশুনা আছে না, মা ?

বৃদ্ধার মন তবু খুসীতে ভরে ওঠে না। তিনি বলেন,—কাজ নেই বউমা, আমাকে বরং ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

তীর্থ যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে যখন স্বামী-স্ত্রী দেখা হয় ক'লকাতায়

ওদের নিভৃত ঘরটিতে, তখন মায়ের এই স্নেহপ্রবণতার কথা নিয়েই আলোচনা করে বেশী।

অমিয় বলে,—সমাজ বদলালে মানুষও বদলায়।

সুজাতার প্রশ্ন,—সমাজ বদলেছে কী?

অমিয়র উত্তর,—চোখ চেয়ে দেখতে পেলে না? চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত প'ড়েছে।

একদিন রাত্রে—বিছানায় শুয়ে সুজাতা বলে উঠলো,—আমাদের জীবন কি এই ভাবেই কাট্‌বে, এই ঘোরাঘুরি ক'রে?

—মন্দকী? তুমি কি ক্লান্ত?

—না।

আজও ওদের দেখা যায়। প্রায় সারা বছর ধরেই ওদের তীর্থযাত্রা চলে। কখনো কেদার-বদরী, কখনো দাক্ষিণাত্য, কখনো নেপাল-পশুপতিনাথ। ঘুরতে ঘুরতে কখনো-সখনো দেখা হয়ে যায়। অমিয় এসে ওকে জিজ্ঞাসা করে,—সব ভালোত?

—হ্যাঁ। তোমার?

—আমারও ভালো।

আবার যে-যার পথে চলে যায়। যাত্রীদের কেউ কেউ কখনো-কখনো জিজ্ঞাসা করে অমিয়কে,—ও তোমার কেউ হয় নাকি, বাবা?—আজ্ঞে হ্যাঁ। স্ত্রী।

বর্ষিয়সী যাত্রিনীর মুখে আর বাক্য সরে না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে,—তাহলে ওদলে কেন?

অমিয় উত্তর দেয় না। অল্প হাসে। তারপরে তাড়া দেয় যাত্রীদের, চলুন-চলুন—দেরী করলে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আর ওদিকে, ক'লকাতায়, অমিয়র মা তার তীর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তার মধ্যে নিজের ছেলেরা ত আছেই, কিন্তু খুকু হয়েছে তার চোখের মণি।

শেষ